

মোগল যুগের বিচার

আবু জাফর



মোগল যুগের বিচার

আবু জাফর



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মোগল যুগের বিচার

আবু জাফর

ইফা প্রকাশনা : ৭৮৪/২

ইফা গ্রন্থাগার : ৯৫৪.০২

ISBN : 984-06-1144-5

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০১০

চৈত্র ১৪১৬

রবিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৯.০০ টাকা

MUGHAL JUGER BICHAR (Judgement of the Mughal Rulers) :
Written in Bangla by Abu Jafar and published by Abu Hena Mustafa
Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-
Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 March 2010

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Website : www.islamicfoundaton.org.bd

Price : Taka 29.00; US Dollar 1.00

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা	॥	৯
সম্রাট বাবর	॥	২৬
সম্রাট হুমায়ুন	॥	৩০
সম্রাট আকবর	॥	৩৬
সম্রাট জাহাঙ্গীর	॥	৪৬
সম্রাট শাহজাহান	॥	৫৬
সম্রাট আওরঙ্গজেব	॥	৬১
মোগলদের দণ্ডবিধি	॥	৬৭
গ্রন্থপঞ্জি	॥	৭৪

প্রকাশকের কথা

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঠান সুলতান ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন সম্রাট বাবর। এ সময় থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইন্তেকাল পর্যন্ত ১৮১ বছর উপমহাদেশে কার্যকর মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর থেকে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সকলেই সাম্রাজ্য শাসনের অংশ হিসেবে বিচার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জানা যায়, বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের অনুকরণে মোগল বাদশাহগণ তাঁদের আদালত পদ্ধতি গঠন করেন। তারা একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ, এমনকি একই ধরনের নামও গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই। মুসলিমদের বিচার হতো ইসলামী মূল্যবোধের আওতায়, কিন্তু অমুসলিমদের বিচার তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নীতি মোতাবেক করা হতো। মোগল সম্রাটগণ অমুসলিমদের উপর কখনো ইসলামী মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন নি। এটি ছিল মোগল যুগের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মোগল যুগে যেসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো তা হলো : বদান্যতা, নিরপেক্ষ বিচার, ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পরিদর্শন, দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন, অপরাধী দমনের উপর গুরুত্ব প্রদান এবং জনগণের আস্থা অর্জন ও বিচারের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা। তবে তাদের বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ যে দিকটি ছিল তা হলো দেশে বিচারের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও লিখিত আইন ছিলো না। তা সত্ত্বেও বিশাল মোগল সাম্রাজ্য জুড়ে নিরপেক্ষ ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের বিচার ব্যবস্থা যে সমকালীন বিশ্বে উন্নত ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা হিসেবেই সুখ্যাতি লাভ করেছিল, সে কথা অনস্বীকার্য।

মোগল যুগে সম্রাটগণ কিভাবে বিচার করতেন, এতদসংক্রান্ত সম্রাটগণের অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন গ্রন্থ ইতঃপূর্বে রচিত হয়নি। প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও অনুবাদক আবু জাফর রচিত 'মোগল যুগের বিচার' শীর্ষক বইটি এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এ বিবেচনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে। প্রকাশের পরপরই সুধী সমাজ ও গবেষকমহলের কাছে গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে গ্রন্থটি পুনরায় মুদ্রিত হয়। অব্যাহত চাহিদা ও উপর্যুপরি তাগাদার প্রেক্ষিতে গ্রন্থটি বর্তমানে পুনঃ প্রকাশ করা হলো। আশা করি, এটি পূর্বের ন্যায় সুধী পাঠক-গবেষকদের কাছে সমাদৃত হবে।

মননশীল পাঠকদেরকে উন্নতমানের গ্রন্থ উপহার দেয়ার আমাদের সদিচ্ছাকে আল্লাহ পাক কবুল করুন। আমীন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহর হাজার শোকর, 'মোগল যুগের বিচার' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর আমার কয়েকজন বন্ধু এবং কতিপয় সম্মানিত পাঠক এর কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান সংস্করণে সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা হয়েছে। মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

আগের মত এবারও বইখানি পাঠকগণের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

আবু জাফর

৭৪, ডি আজিমপুর কলোনী

ঢাকা-৫

আগস্ট ১৯৮৫ খ্রি.

আমার কথা

কোন জিনিসকে এক তরফা বিচার করা ঠিক নয় ; মোগল বাদশাহরা যে কেবল নিরীহ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন আর ইচ্ছামত ভোগ-উপভোগ করতেন তা নয়। প্রথম অবস্থায় বিজিতদের আনুগত্য আদায়ের জন্য সম্ভবত তা করতেও হয়েছিল ; কিন্তু সেটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার নয়। বরং খাজনার পদ্ধতিতে তারা একটা প্রথা কায়েম করেছিলেন যা বাদশাহ্ শেরশাহের আগে এদেশে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ।

সে যা-ই হোক, মোটামুটিভাবে মোগল যুগের বিচার ব্যবস্থার একটা পূর্ণ রূপরেখাকে যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, ইনসাক ও ইনসানিয়াতের মাপকাঠিতে তা কতখানি উজ্জ্বল ও নজীরবিহীন।

দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া এবং নিরীহ প্রজাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে তাঁরা যে বিশেষ সচেতন ছিলেন, ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত মোগল সম্রাটদের নিরপেক্ষ বিচার সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একথা সত্য যে, প্রথম দিকে মোগল সম্রাটরা বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন না। অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই তাকে শাস্তি দেওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে এই শাস্তির মাত্রা ধারণার বাইরে ছিল। প্রথম দিকে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে মোগল সম্রাটরা পিছ পা হতেন না। সমাজে এর একটা সুদূরপ্রসারী সুফলও দেখা দিয়েছিল। অনেকে শাস্তির ভয়ে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকত। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। প্রজাদের জান-মালের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়েছিল।

মোগল সম্রাটদের রাজ্য বিস্তার, শাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের বিচার পদ্ধতি বা তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন সে সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম—নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

মোগল সম্রাটগণ কিভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, সে সম্পর্কে আমি এ পুস্তকে সামান্য আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। অনেক লোমহর্ষক বিচারের কাহিনী লোকমুখে শুনেছি। কিন্তু কোন প্রমাণনির্ভর দলীল না পাওয়ায় তা উল্লেখ করতে পারিনি। এ ব্যাপারে গবেষকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে অনেক অজানা তথ্যও উদঘাটিত হবে। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁদের উৎসাহ সৃষ্টিতে সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

আবু জাফর

৭৪-ডি আজিমপুর কলোনী,

ঢাকা-২

৫ই আগস্ট ১৯৮০

প্রসঙ্গ কথা

আইন ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে মোগলদের ধ্যান-ধারণার কোন মূলগত পার্থক্য ছিল না। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে এ ব্যাপারে তাদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের একটা অন্যতম কাজ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার পরিচালনা করা। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এবং নগরের বাসিন্দাদের জান-মাল রক্ষার ব্যাপারে মোগল সম্রাটগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে গ্রামসমূহের বিচার পদ্ধতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা গ্রাম্য প্রধানদের উপর নির্ভর করতেন। গ্রামের শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় লোক কর্তৃক নিয়োজিত চৌকিদাররাই ছিল সর্বেসর্বা। অবশ্য ফৌজদারের ওপর এসব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকতেন যে একমাত্র কুখ্যাত ডাকাতদের শান্তি, মারাত্মক ধরনের আইন অমান্যের শান্তি, স্থানীয় বেয়াড়া জমিদারদের শান্তি দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছু করতে পারতেন না।^১

মোগল বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

“মুসলিম রাজ্যের অমুসলিম জনসাধারণ ইসলামী আইনের আওতাভুক্ত নয়। অমুসলিমদের ক্রিয়াকলাপ তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নীতি মুতাবিক নির্ধারিত হত।”^২ সমগ্র নৈতিক ব্যাপারে, যারা মুসলমান শাসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করত, তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া হত এবং যে ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে কোন ব্যাখ্যা ছিল না সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে রক্ষা করা হত।^৩

দিল্লীর সুলতানগণ বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদের অনুকরণে তাঁদের আদালত-সমূহ গঠন করেন, একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন, এমন কি একই ধরনের নাম গ্রহণ করেন। আব্বাসীয় খলীফাগণ যে সূত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন,

১. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration.

২. Baillies Muhammadan Digest of Muslim Law, p. 14, Quoted from Our Police Heritage, N.A. Razvi.

৩. Hidaya. edited by Hamilton and Grady, quoted from Ibid.

সেই একই সূত্র থেকে দিল্লীর সুলতানগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে অমুসলিমদের ওপর তারা ইসলামের জীবন বিধান আরোপ করেন নি।^৪

গ্রামসমূহের বিচার পদ্ধতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে গ্রাম্য প্রধানদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। অধিকাংশ গ্রাম্য প্রধানই ছিলেন হিন্দু। ফৌজদারী আইন পরিচালনা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নমনীয়। অমুসলিমদের মধ্যকার গোলমাল মীমাংসার জন্য তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধর্মযাজকদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হত। বিশেষ জটিল মামলার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যা আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ ছিল, এমন বিষয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত। স্থানীয় জমিদারগণকে কখনও কখনও নযরানা দেওয়ার এবং স্থায়ী পদ্ধতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অনুমতি দেওয়া হত। এসব জমিদার তাই বলে শাসক ছিলেন না। অভিযোগকারী যেকোন আদালতে তার আবেদন জানাতে পারত। গো-হত্যার এক মামলায় (মুসলিম ও হিন্দু আইনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান) একজন মুসলমান কাবীর রায় দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব একজন হিন্দু গভর্নরের নিকট অর্পণ করা হয়।^৫

মোগল সম্রাটগণ প্রথম থেকেই সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন-ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের প্রভু হিসেবে ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মঙ্গল সাধন করা।^৬ মোগল সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। মোগল সম্রাটগণ অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন কিন্তু তাঁরা কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত লোকের স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন না। সরকারী কাজে তাঁরা সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন।^৭ দণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। সম্রাট আকবর প্রায় বলতেন, “একজন রাজাকে অবশ্যই অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ নবী (সা) বলেছেন, অবিচারের শিকার ব্যক্তির কান্না, এমন কি সে কাফির হলেও, আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না।”^৮

বিচার ব্যবস্থার নীতি

মধ্যযুগীয় বিচার ব্যবস্থা ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য বিরাট সাম্রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেইজন্য মোগল সম্রাটগণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কতকগুলো বিষয় নীতি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এগুলো হলো বদান্যতা, নিরপেক্ষ বিচার, ফৌজদারী প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পরিদর্শন, দ্রুত

৪. N. A. Razvi, Our Police Heritage,

৫. N. A. Razvi, Our Police Heritage.

৬. এস. এ. কিউ হোসেনী, Administration under the Mughals, p. 213.

৭. ঐ

৮. এম. বি. আহমদ, Administration in Justice in Medieval India.

বিচার কার্য সম্পাদন , দমনের ওপর গুরুত্ব এবং জনগণের আস্থা অর্জন ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান।

বদান্যতা

মোগল সম্রাটগণের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল বদান্যতা। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দিতে (বিদেষ্পপ্রসূতভাবে নয়) তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। আকবর বলতেন, “সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান একটি অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ কাজ নম্র ও নিরপেক্ষভাবে করা উচিত।”^৯

নিরপেক্ষতা

শেরশাহ ন্যায়বিচারকে ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে সর্বোত্তম মনে করতেন। জাহাঙ্গীর প্রকাশ্যে প্রত্যহ ন্যায়বিচার পরিচালনাকে তাঁর একটা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। শাহজাহান বলতেন যে, ন্যায়বিচার তাঁর সরকারের মূল ভিত্তি। আওরঙ্গজেবের মতে, তাঁর প্রশাসনের উদ্যান ন্যায়বিচারের বারিধারায় সিঞ্চিত হয়।^{১০}

ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে মোগল সম্রাটগণের নিরপেক্ষতা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এর জন্য তাঁরা শুধু প্রসিদ্ধই হন নি, সমগ্র রাজ্যকে একতাবদ্ধ করতে তথা প্রতিটি লোকের আস্থা অর্জন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। সরকারী পদমর্যাদা বা রাজকীয় রক্তের বন্ধন তাঁদেরকে কঠিনতম শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রাখেনি। এমন কি উত্তম শাসনকর্তার সুনামকে রক্ষার জন্যও তাঁরা ন্যায়বিচার পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন নি। মোগলদের কাছে সম্মান ছিল আস্থার মধ্যে-ভীতির মধ্যে নয়। কোন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী অবিচার অথবা উৎপীড়নের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হলে সম্রাটগণ তাকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন। আকবরনামায় উল্লেখ আছে যে, সম্রাটগণের সর্বোত্তম উপাসনা হলো প্রজাদের প্রতি সুবিচার করা। মোগলদের এই নিরপেক্ষ বিচার বিশেষভাবে সুবিদিত ছিল। সামান্য একজন অভিযোগকারীও সম্রাটদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। সাধারণ লোকের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার কায়ম করার জন্য তাঁরা যত্নবান ছিলেন। ফলে ক্ষমতাহীন লোকেরা ক্ষমতাবান লোকের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হত না। রাজকীয় কর্মচারীদের হাত থেকে তাঁরা প্রজাদের রক্ষা করারও চেষ্টা করতেন।^{১১}

সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পরিচালনার প্রতি সম্রাটগণের সমর্থন ছিল। সম্রাটের নির্দেশক্রমে জটিল মামলাসমূহ তাঁর সম্মুখে পরিচালিত হত। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন সদয় এবং বদান্যতার গুণে গুণান্বিত। কিন্তু অন্যায়ভাবে তিনি কাউকে

৯ . Saran, The Provincial Government. Quoted from Ibid.

১০. N. A. Razvi, Our Police Heritage.

১১. এস. এ. কিউ হোসেনী, Administration under the Mughals. p.199.

অনুকম্পা দেখাতেন না। আবুল ফজল লিখেছেন, মহামান্য সম্রাট তাঁর দরবারে আত্মীয় এবং একজন পথিক, কোন প্রধান ব্যক্তি এবং সাধারণ ভিক্ষুকের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।^{১২} সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর একজন শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হও। যে এলাকায় তুমি কাজ কর সেই এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কোন নযরানা গ্রহণ করবে না বা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করবে না। দারিদ্র্যের মধ্যে, আত্মতুষ্টি লাভ করার মধ্যেই তোমার গৌরব নিহিত।”^{১৩}

মোগল সম্রাটগণ নিরপেক্ষ বিচারের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সম্রাট আকবরের প্রধান ট্রেড কমিশনার একটা হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করে। এই অপরাধের জন্য আকবর তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দেন।^{১৪} খানে আজম মীর্জা আজীজ কোকা আকবরের দরবারে একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন আকবরের বাল্যবন্ধু। খানে আজম যথেষ্ট কারণ ছাড়াই একজন কর্মচারীকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দেন। উক্ত কর্মচারীর পিতা সম্রাট আকবরের নিকট আবেদন জানালে তিনি তদন্ত করে খানে আজমকে দোষী সাব্যস্ত করেন। খানে আজম উক্ত পরিবারকে রক্তের অর্থ (Blood money) দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পান। একজন সাধারণ লোককে হত্যা করার অপরাধে আকবর একজন ক্ষমতাশালী সামরিক প্রধানকে হত্যা করার আদেশ দেন। সাধারণ লোকটির মাতা এ ব্যাপারে আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আকবরের প্রিয় আমীর খানে আলমের ভাইপো হোসাইনকে সামান্য একজন লোককে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় লাহোরের কোতোয়াল মীর্জা বেগ একটা অন্যায় কাজের জন্য কাযীকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেন। কাযী আত্মরক্ষার চেষ্টা করার সময় মারা যান। কোতোয়াল অপরাধী বলে বিবেচিত হয় এবং তাকে কাযীর উত্তরাধিকারের নিকটই রক্তের অর্থের বদলে সমর্পণ করা হয়। তার আবেদন বিচারাধীন থাকাকালে সে মারা যায়। আওরঙ্গজেব পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে একজন কাযীকে প্রকাশ্যে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন এবং তাকে অপসারিত করেন। সাধারণ এক মহিলার অভিযোগ মূতাবিক আওরঙ্গজেব তাঁর একজন ফৌজদারকে অন্যত্র বদলি করেন। গুজরাটের শাসনকর্তার জামাই আহমদ শাহ একজনকে হত্যা করেন। এর জন্য কাযী ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন। সম্রাট এই আদেশকে যথায় মনে না করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

১২. আবুল ফজল, আকবরনামা

১৩. এম. বি. আহমদ, Administration of Justice in Medieval India.

১৪. বদাউনী, N. A. Razvi-এর Our Police Heritage থেকে উদ্ধৃত।

কঠোর শাস্তি

ফৌজদারি অপরাধে অপরাধীদের যে শাস্তি দেওয়া হত তা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য শাস্তি লঘু করা হত। যে অপরাধ সমাজে বিস্তার লাভ করত এবং যার ফলে সমাজে অসন্তোষের কারণ দেখা দিত, সেসব ক্ষেত্রে শরীয়তে বিধান থাকুক বা না থাকুক মারাত্মক এবং কঠোর শাস্তির বিধান করা হত। এসব ক্ষেত্রে সম্রাটগণ প্রায়ই তাঁদের উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদান করতেন। যারা মারাত্মক অপরাধে অপরাধী হত তাদেরকে হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট করা হত অথবা শূলে চড়ান হত। যারা অপরকে অপরাধের পথে প্রলুব্ধ করত এবং নারী ধর্ষণ বা ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হত তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হত বা গলা টিপে হত্যা করা হত। অপরাধীদের হাত-পা কেটে শাস্তি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বকালের ষষ্ঠ বছরে এই রীতি বন্ধ করে দেন।

উদম খান নামক জনৈক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে সম্রাট আকবর নিজে তাঁকে একটা দুর্গের ওপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করেন। জাহাঙ্গীর সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের (Condemned Prisoners) দেহ হাতীর দ্বারা টুকরো টুকরো করে দিতেন। সাতটা অপরাধে অপরাধী একজন ডাকাতকে তাঁর আমলে (জাহাঙ্গীর) শরীরের এক একটা অংশ ছিন্ন করে শাস্তি দেওয়া হয়। শাহজাহান একজন দুর্নীতিপরায়ণ কোতোয়ালের ওপর বিষ প্রয়োগ করেন এবং উন্মুক্ত আদালতে তার মৃত্যু দৃশ্য দেখেন। একজন অপরাধী ব্যক্তিকে তিনি সর্প দংশন দ্বারা মৃত্যু ঘটান।

তাঁহাড়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদ্দেশ্যে অপরাধীদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হত। অপরাধীদের লজ্জা দেওয়ার জন্য তাদেরকে গাধার পিঠে চড়িয়েও রাস্তায় রাস্তায় ঘোরান হত। অপরাধীরা যতদিন পর্যন্ত তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত না হত ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী করে রাখা হত। শাস্তি বিঘ্নকারীদের তাদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হত। প্রধান ঘাতক শাস্তি প্রদান এবং যন্ত্রণা দেওয়ার বিভিন্ন হাতিয়ার প্রদর্শন করত। এই সমস্ত হাতিয়ার দিয়ে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে জীতি প্রদর্শনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

দমনমূলক কার্যকলাপে স্থায়ী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য অফিসার ও গভর্নরদের নিখোঁজ, ডাকাতি বা চুরির ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর অভিযোগ মূতাবিক ক্ষতিপূরণ দিতে হত। বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশের মাধ্যমে আকবর সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সঠিক অভিযোগকে উৎসাহিত করতেন।

এই সমস্ত যৌথ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ফলে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিল না। রাস্তায় পথিক নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে পারতেন, ব্যবসায়ীরা তাদের মালপত্রসহ নিরাপদে বাংলা থেকে কাবুলে এবং তেলিঙ্গানা থেকে কাশ্মীরে যেতে পারতেন।

আইনের ধারণা

রাজদ্রোহিতার অপরাধ আল্লাহ ও ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিবেচিত হত এবং জনগণের ওপর উৎপীড়নকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হত।

ন্যায়বিচারের দায়িত্ব

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার প্রধান দায়িত্ব সম্রাটের ওপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণত তিনি বেশীর ভাগ ফৌজদারী ও জটিল দেওয়ানী মামলার বিচার করতেন। আব্বাসীয় এবং উমাইয়া খলীফাদের অনুকরণে মোগল সম্রাটগণ একটা নির্দিষ্ট দিনে ব্যক্তিগতভাবে ফৌজদারী কার্যকলাপ দেখাশোনা করতেন। বৃহস্পতিবারে আকবর, মঙ্গলবারে জাহাঙ্গীর এবং বুধবারে শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব বিচার কার্য সম্পাদন করতেন।

কোন প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব সেই এলাকার ওপর সম্রাটের মত ছিল। অন্যান্য কাজসহ গভর্নরের দায়িত্ব ছিল ন্যায়বিচার সম্পাদন করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

দমনমূলক কার্যকলাপ

জনগণের মঙ্গল সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করে মোগল সম্রাটগণ কখনও কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আকবর উত্তর প্রদেশের এটা (Etah) জেলার সাকিতে (Sakit) শিকারে গেলে জানতে পারেন যে, প্রায় চার হাজার লোকের একটা দল স্থানীয় অধিবাসীদের হয়রানি করছে। তিনি তাঁর শিকারের পরিকল্পনা বাতিল করে মাত্র দু'শ ঘোড়া-সওয়ারসহ তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। দলটি সাকিত থেকে পনের মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পারাউকে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সংঘর্ষে আকবর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান এবং তাঁর হাতী মারাত্মকভাবে আহত হয়। শেষে যে দালানে দলটি আশ্রয় নিয়েছিল তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ফলে এক হাজার লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।^{১৫}

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে মোগল সম্রাটগণ বিশেষ সততার পরিচয় দিতেন। তাঁরা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ছিলেন এবং কখনও কখনও তাঁরা পৃথিবীতে নিজেদেরকে “আল্লাহর ছায়া” (জিল্লে-ইলাহী) হিসেবেও মনে করতেন। কিন্তু তবুও তৎকালীন বেশ কয়েকজন প্রধান বিচারক স্বাধীন হিসেবে

সুবিদিত ছিলেন। ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণ ও সম্রাটগণের এত বেশি আস্থা ছিল যে, সংকটের সময় তাঁরা প্রধান বিচারপতির আশ্রয় নিতেন। আকবর যখন গুজরাট ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তাঁর একজন কর্মচারী জনৈক গ্রামবাসীর জুতা কেড়ে নিয়েছিল। এই অপরাধে কর্মচারীটির পদদ্বয় ছিদ্র করে দেওয়া হয়। আকবর অবশ্য আইনের কতিপয় মৌলিক পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা বিচার কার্য পরিচালনা করতেন তাঁদের বিরোধিতায় তিনি তা করতে পারেন নি। ফৌজদারী মামলায় যথাযথ বিচার কার্য সমাধা করা এমনই একটা নৈতিক মর্যাদা পেয়েছিল যে, এর ব্যতিক্রম হলেই জনগণ ক্ষেপে উঠত। কাযী শামসুদ্দিন মেহের একজন দরবেশকে বন্দী করেন। এজন্য সম্রাট তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সম্রাটের আদেশ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।^{১৬}

ফৌজদারী কার্যবিধি

সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধি স্থায়িত্ব লাভ করে। কোন মামলা চলাকালীন সময়ে উভয় পক্ষকে তাদের উকিল এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হত। সাক্ষী এবং দলীল পরীক্ষা ছাড়াও সত্য উদঘাটনে প্রয়োজনবোধে বিচারক ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত চালাতেন। কাযীর ব্যক্তিগত তদন্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক সম্রাট ব্যক্তিগত তদন্তকে উৎসাহ দিতেন। মোকারররব খানের মামলা চলার সময় জাহাঙ্গীর ব্যক্তিগত তদন্তের জন্য তা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং সরেজমিনে তদন্ত করতেন। প্রজারা শান্তিতে বাস করে কিনা তা স্বচক্ষে দেখার জন্য সম্রাট বাবর রাতে ছদ্মবেশে বাইরে যেতেন।

সাক্ষ্য

ফেরার আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত। উভয় পক্ষ বা তাদের উকিলগণ উপস্থিত না থাকলে বিচারের রায় প্রদান করা হত না। স্বাধীন সমর্থক বস্ত (Free corroboration or tawatar), একক ব্যক্তির বিবৃতি (Ihad) এবং দোষ স্বীকারের (Iqrar) ওপরে সাক্ষ্য নির্ভর করত। শ্রুত বস্তব্য একেবারে অগ্রাহ্য না হলেও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রায় অসম্ভব, যেমন ব্যভিচার, এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত।

দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন

তাড়াতাড়ি বিচার কার্য সম্পন্ন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিচার কার্য বিলম্ব করা বিচার অস্বীকার করারই নামান্তর। মোগল যুগে বিচার কার্য দ্রুত সম্পন্ন করা

হত। পদ্ধতিগত বিশেষ কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। তবে বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য অন্যায়ভাবে কোন উপায় অবলম্বন করা হত না। কোন মামলায় সাক্ষীকে উপস্থিত করার জন্য সর্বোচ্চ এক মাস সময় দেওয়া হত। আদালতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিচার হোক বা না হোক অপরাধীকে প্রতিদিন আদালতে হাযির করার জন্য আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আগুন, পানি ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষা

প্রাচীন ভারতে হিন্দু রাজাগণের আমলে আগুন, পানি ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষা করে বিচার করার পদ্ধতি চালু ছিল। কোন অপরাধে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হত বা তার নির্দেশিতা প্রমাণ করার জন্য উত্তপ্ত লোহা হাতের ওপর রাখতে হত। মুসলিম শাসকগণ এই পদ্ধতি বাতিল করে দেন। তবে অমুসলিম প্রদেশসমূহে এই সব পদ্ধতির ওপর মোগল সম্রাটগণ হস্তক্ষেপ করেন নি। সম্রাট আকবর এই সব পদ্ধতি পুনরায় চালু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আইনজ্ঞগণ তাঁকে বাধা দেন।

শ্রেফতার ও তল্লাশী

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধ করতে দেখলে তাকে শ্রেফতার করতে পারত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, রাজিয়া সুলতানার হত্যাকারী একজন হিন্দু কর্তৃক ধৃত হয়। শ্রেফতারের তত্ত্বাবধানে সাধারণত কোতোয়াল নিযুক্ত থাকতেন। তিনি শ্রেফতার সম্পর্কে কার্যীকে অবগত করাতেন। একইভাবে ফৌজদার শ্রেফতার সম্পর্কে গভর্নরকে অবহিত করতেন।

তদন্ত কার্যে নিয়োজিত পুলিশ অফিসার গৃহ বা কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাসী করতে পারতেন। এ ধরনের ক্ষমতা কাযীরও ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষেত্রে কাযীর সাহায্য ছাড়াও প্রশাসনিক সাহায্য নেওয়া হত। জমির ক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে কাযী, কোতোয়াল বা ফৌজদার তল্লাশী চালাতে পারতেন। দাঙ্গা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারকে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা কাযীর ছিল বা নিজেই তিনি তা তদন্ত করতে পারতেন।

বিচার বিভাগ

বস্তুর সম্রাট ছিলেন শীর্ষস্থানীয় বিচারক। তাঁর আদালত ছিল শীর্ষস্থানীয় আপীল আদালত। ছোট শহর বা গ্রামসমূহের বিচারের ভার ছিল কাযী-ই-পরগনার ওপর, জেলার বিচারের ভার কাযী-ই-সরকারের ওপর এবং সমগ্র দেশের বিচারের ভার ছিল কাযী-ই-কুযাত বা প্রধান বিচারপতি এবং সম্রাটের ওপর। কাযী ছিলেন ফৌজদারী মামলার প্রধান বিচারক এবং মুসলিম আইন মুতাবিক তিনি বিচার করতেন। এ

ব্যাপারে একজন মুফতি তাকে সাহায্য করতেন। আইন সম্পর্কীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে বিশেষ মামলার জন্য নির্ধারিত আইন সম্পর্কে তিনি কাযীকে অবহিত করতেন এবং সেই মতাবিক কাযী রায় দিতেন। প্রধান কাযী সবসময় সম্রাটের সাথে থাকতেন। প্রত্যেক শহর এবং বড় গ্রামেও স্থানীয় কাযী ছিল। তাঁরা প্রধান কাযী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কোতোয়াল, ফৌজদার এবং শিকদারগণও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আদালতও গঠন করা হত। আদালতের নির্দেশ কার্যকরী করার ভার ছিল প্রশাসনিক অফিসারের ওপর। তিনি দাদবাক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। দাদবাককে সাহায্য করা এবং শান্তি রক্ষার্থে আদালতে বরকন্দাজ নিয়োগ করা হত।

নবনিযুক্ত কাযীর প্রতি দেওয়ানের প্রথাগত দায়িত্ব ছিল নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালনের তাগিদ দেওয়া।^{১৭}

“সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হও। উভয় দলের উপস্থিতিতে আদালত বা সরকারী ভবনে (মহকুমায়) বিচার কার্য পরিচালনা করবে।

“যে এলাকায় তুমি কাজ কর সেই এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে কোন নযরানা গ্রহণ করবে না বা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করবে না।

“ডিক্রি, বিক্রয় দলীল, রেহেন, প্রতিজ্ঞাপত্র এবং অন্যান্য বৈধ দলীলসমূহ অতি সাবধানতার সাথে লিপিবদ্ধ করবে যাতে করে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন ত্রুটি উদঘাটন করে তোমাকে লজ্জার মধ্যে পতিত না করতে পারে।

“তোমার দারিদ্র্যই তোমার গৌরব।”

কোতোয়াল

রাজধানীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রধান পুলিশ অফিসারকে বলা হত কোতোয়াল। ঘোড়সওয়ার এবং বরকন্দাজ সমবায়ে কোতোয়ালের একটা বাহিনী ছিল। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একজন ঘোড়সওয়ার এবং কুড়ি থেকে পঁচিশজন পদাতিক বাহিনীসহ এক একটা ঘাঁটি ছিল। কোতোয়ালের আদালতকে বলা হত ‘ছাবুত্রা’ (Chabutra)।^{১৮}

শহরের প্রশাসন ব্যবস্থায় কোতোয়াল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর বাহিনী রাতে সারা শহরে টহল দিত এবং প্রধান প্রধান সড়ক পাহারা দিত। তিনি অপরাধ দমন করতেন এবং কোন ব্যাপারে তদন্ত করে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করতেন। স্থানীয় লোকের একটা তালিকা দেখে তিনি তাদের কার্যকলাপ

১৭. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration.

১৮. N. A. Razvi, Our Police Heritage.

সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। কোন ব্যক্তির সেই শহরে আগমন ও প্রত্যাগমন সম্পর্কে তিনি খোঁজ রাখতেন। উচ্চ আদালতে প্রেরণার্থ মামলায় তিনি স্বীয় মতামতও ব্যক্ত করতেন।

জেলায় কোতোয়াল একজন বিচারকের দায়িত্বও পালন করতেন। বিচারক হিসেবে তিনি সমগ্র জেলার ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ফৌজদারি অপরাধসমূহের বিচার করতেন এবং ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরাধিকার, তালাক ও অন্যান্য দেওয়ানী অপরাধের বিচার করতেন কাযী।^{১৯}

ছোট ছোট শহরে শিকদারের কাজ প্রায় কোতোয়ালের মত ছিল এবং তাঁর কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ছিল। শিকদারের আদেশের বিরুদ্ধে কোতোয়ালের নিকট এবং তারপর গভর্নর এবং তারপর সম্রাটের নিকট আপীল করা যেত।

ফৌজদার

গ্রাম এলাকায় অপরাধ দমনের জন্য ফৌজদারকে নিয়োগ করা হত। জেলার গভর্নর ফৌজদার নিয়োগ করতেন। ফৌজদার তাঁর এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতেন। তিনি নগণ্য ফৌজদারি মামলার বিচারও সম্পন্ন করতেন। সুবাদারের সহকারীকে বলা হত ফৌজদার।

মুহতাসিব

মুহতাসিবের কাজ ছিল বহুমুখী। জনসাধারণ ঠিকমত ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছে কিনা, মদ পান করে কিনা, জুয়া খেলে কিনা ইত্যাদি তদারকি করা ছাড়াও কোতোয়ালের কাজের ওপরও তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। জনগণের আপীল অনুযায়ী মুহতাসিব বিচার করতেন।

কাযীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা

প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে একজন কাযী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রধান কাযী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রাদেশিক কাযীর অপর কোন নিম্ন আদালত ছিল না। প্রত্যেক শহর ও মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামেও কাযী নিযুক্ত করা হত। যে গ্রামে কোন কাযী ছিল না, সেই গ্রামের কোন অধিবাসী বিচারের আশায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের কাযীর নিকট অভিযোগ জানাতে পারতেন।

প্রাদেশিক কাযীর কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। তাঁর কোন সাহায্যকারী ছিল না। সেইজন্য প্রদেশের মামলাসমূহের অতি অল্প মামলাই তিনি নিজে বিচার করতেন। এইজন্য জনগণকে তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েত (দক্ষিণ ভারতে বলা হত মহাজারস) ব্যবস্থার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হত।

সত্যিকারভাবে কাযীর কাজ ছিল জুরির মত। তিনি অন্যের নিকট থেকে আইন সংগ্রহ করতেন এবং বিশেষ মামলার রায় অতীত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রদান করতেন। মুফতি ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকারী। মুফতির কাজ ছিল আইনের ব্যাখ্যা দান করা ও বিশেষ মামলায় আইন প্রয়োগ করা এবং কাযীর কাজ ছিল আইন কার্যকরী করা। কাযীকে অবশ্যই একজন নির্দোষ জ্ঞানী মুসলমান এবং পবিত্র আইন সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকতে হতো।

অধিকাংশ কাযীই আইনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু কাযীর প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা ছিল সাধুতা, নিরপেক্ষতা, নৈতিক উৎকর্ষতা এবং স্থানীয় সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বজায় রাখা। তবে বাস্তবে এ গুণাবলীর সমাবেশ কোন কাযীর মধ্যে খুব অল্পই ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রধান কাযী আবদুল ওহাব বোরার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মাত্র ১৬ বছরের চাকুরী জীবনে তিনি নগদ ৩৩ লাখ টাকা এবং বহু অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকার শায়েখ-উল-ইসলাম ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। তিনি তাঁর পিতার অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁর অংশের সমস্ত অর্থ তিনি ধর্মীয় কাজে ব্যয় করেছিলেন। তিনি সর্ব প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্ব থেকে বিচার করতেন। এমন কি তিনি নিকট বন্ধু ও জ্ঞাতি লোকদের প্রচলিত উপটৌকন প্রথাও বন্ধ করে দেন।^{২০}

মোগল আমলে কাযীগণ প্রশাসন কর্তৃক যথেষ্টভাবে সমর্থিত হতেন না। বারনিয়ার লিখেছেন :^{২১}

“কাযীগণ ও বিচারকগণ জায়গীরদার, গভর্নর এবং খাজনা আদায়কারীর অত্যাচার থেকে কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। এই অব্যবস্থাই রাজধানী শহরের আশেপাশে, বড় বড় শহর ও সমুদ্র বন্দরে পরিলক্ষিত হত না। কারণ এসব স্থানে মারাত্মক অব্যবস্থা আদালতের অগোচরে রাখা যেত না।” আবার “পালিত না হলে ভাল আইনের কোন অর্থই হয় না এবং সেই সব আইন কার্যকরী করার সম্ভাবনাও ছিল পরাহত। সত্যিকারভাবে গভর্নর ছিলেন সর্বময় কর্তা। তিনি ছিলেন বিচার বিভাগের পরিচালক এবং সম্রাটের ট্যাক্স ধার্যকারী এবং গ্রহণকারী”।

তবে প্রচলিত আইনের ওপর কাযীর প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তা যথাযথভাবে কার্যকরী করতেন। প্রাদেশিক গভর্নরগণ কাযীর ক্ষমতায় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁকে অমান্য করতেন না। কারণ সব সময় তিনি পবিত্র আইনের নামে সম্রাটের নিকট আপীল করতে পারতেন।

২০. যদুনাথ সরকার, History of Aurangozeb.

২১. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration থেকে উদ্ধৃত।

মুসলিম আইন অনুযায়ী কাযীকে অবশ্যই তাঁর দায়িত্ব একটি মসজিদে অথবা অন্য কোন স্থান যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, এমন স্থানে সম্পাদন করতে হবে। শহরের জামে মসজিদে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সুপারিশ করা হত। তিনি তাঁর নিজের বাড়িতেও মাঝে মাঝে আদালতের কাজ সম্পাদন করতে পারতেন। এমন ক্ষেত্রে উক্ত বাড়িতে জনসাধারণের স্বাধীনভাবে গমনাগমনের সুযোগ থাকতে হবে এবং তাঁকে উভয় পক্ষের জন্য বসার স্থান, সুযোগ-সুবিধা এবং সাধারণ ব্যবহার সমানভাবে করতে হবে।

কাযীর অফিসের কাজ সম্পর্কে রাজকীয় যে আদেশ ছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দের দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, গুজরাট প্রদেশের বিচারকগণ সপ্তাহের দুদিন মহকুমা-ই-আদালতে বসেন, দুদিন (মঙ্গল ও বুধবার) সুবাদারের দরবারে উপস্থিত থাকেন এবং সপ্তাহের বাকি তিন দিন ছুটি ভোগ করেন। সম্রাট উক্ত প্রদেশের দেওয়ানকে লেখেন, “এই ধরনের কার্য পদ্ধতি রাজকীয় বা অন্য কোন সুবার মত নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি গুজরাটে চলার কোন কারণ থাকতে পারে না।” শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার অফিসে কাজ করার জন্য, বুধবার সুবাদারের অফিসে যোগদান করার জন্য এবং শুক্রবার ছুটি ভোগ করার জন্য বিচারকগণকে অনুরোধ জানাতে দেওয়ানকে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে আরও উল্লেখ করা হয়— “সূর্য ওঠার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আদালতে বসে বিচারকগণের বিচার করা উচিত এবং যোহর নামাযের সময় তাঁদের ঘরে ফেরা উচিত।”^{২২}

রাস্তায় ডাকাতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কাযীগণই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন—সম্রাট বা তাঁর বেসামরিক অফিসারগণ স্বাধীনভাবে এই আদেশ দিতে পারতেন না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই পাঁচিশ ডাকাতকে গলা কেটে হত্যা করেন। এটা ছিল আইন অমান্যকারী জনগণের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং কুরআনের আইন অনুযায়ী তাঁর আচার-আচরণ সংযত করেন। রাস্তায় ডাকাতি করার অভিযোগে একজন ডাকাতকে হত্যা করার জন্য তিনি তাঁর উচ্চপদস্থ জেনারেলকে তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা কাযীর নিকট সমর্পণ করার অনুরোধ জানান।^{২৩}

১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন সংবাদ লেখকের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, বাংলার গভর্নর ইব্রাহিম খান ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অপব্যবহার করে

২২. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration.

২৩. ঐ

আদালতে পালঙ্কে (চারপাই) উপবেশন করেন এবং কাযী ও অন্যান্য বিচার বিভাগীয় অফিসারগণ মেঝেতে বসেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ গভর্নরকে লিখিত এক পত্রে জানান যে, তিনি (গভর্নর) যদি কোন অসুখের কারণে মেঝেতে বসতে অপারগ হন তাহলে তাঁর উচিত অসুখ সারানোর জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া।^{২৪}

স্থানীয় দায়িত্ব

স্থানীয় দায়িত্বের ভিত্তি ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক অন্যায-অনাচার দূর করার জন্য সমানভাবে দায়ী। তাছাড়া বিশেষ গোত্রকেও বিশেষ কাজ করা বা না করার জন্য গোত্রের সকলকে সমানভাবে দায়ী করা হত। সামগ্রিক এই দায়িত্বের সুফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

শান্তি ও দমনমূলক কার্যের ক্ষেত্রে সমাজ এমন পস্থা অবলম্বন করত যেন কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা তারা শাসনকর্তারও রোষের কারণ না হয়। স্থানীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এমন ছিল যে, এই ব্যবস্থায় সরকারী কোষাগার থেকে কোন অর্থ ব্যয় হত না।

গ্রামের শাসন পরিচালনায় প্রত্যেক গ্রামবাসী একই সাথে কাজ করত।^{২৫} গ্রাম ছিল রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামসমূহ সত্যিকারভাবে স্থানীয় স্বাধীন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে। একমাত্র জেলা ও মহকুমার বিচার ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামের বিচার ব্যবস্থায় সম্রাটগণ হস্তক্ষেপ করেন নি। রাস্তায় পথিকদের নিশ্চিন্তে চলাফেরার জন্য যে ব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন তা করার জন্য রাষ্ট্র গ্রামবাসীকে দায়িত্ব অর্পণ করে। একমাত্র এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সেই সময় বিশাল ভারতে বিশেষ সুফল আশা করা হয়ত সম্ভব ছিল না।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন। সকল রকমের বিরোধের মীমাংসা পঞ্চায়েত করত। আদালতের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সঠিক রায় দিতে পারত। কারণ ঘটনা সম্পর্কে পঞ্চায়েত অবহিত থাকত। পঞ্চায়েতের কার্যপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : জনগণ এক সাথে মিলিত হয়ে কোন ব্যাপারে আলোচনা করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হত। স্যার ডাবলু, এইচ. স্লিম্যান অযোধ্যার এক গ্রামবাসীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

“কোন লোক কোন অন্যায কাজ করলে তাকে গ্রাম বা গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ বা সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির নিকট ডেকে পাঠান হয়। সে তার অপরাধ অস্বীকার করলে

২৪. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration.

২৫. Cambridge History of India.

তাকে গোসল করতে বলা হত এবং তুলসী গাছের ওপর হাত রেখে জোরে জোরে তার নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করতে বলা হত। এ কাজ করতে সে অস্বীকার করলে সে যা গ্রহণ করেছে তা প্রত্যর্পণ করার বা যথার্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এ কাজ করতেও সে অস্বীকার করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হত এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ত।”^{২৬}

মোগল সম্রাটগণ অনেক ক্ষেত্রে কাথিওয়ার, রাজ পিপলা প্রভৃতি এলাকার জমিদারদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। করের বিনিময়ে এইসব জমিদারগণ স্বাধীনভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোগল সম্রাটদের দৈনন্দিন জীবন

প্রাথমিকালীন নামায শেষে সম্রাটগণ ‘দর্শন’ বারান্দায় বসে হাতীর লড়াই ও পদাতিক বাহিনীর প্যারেড মার্চ উপভোগ করতেন। তারপর দেওয়ান-ই-আম হলে দু’ঘণ্টা যাবত সরকারী কাজকর্ম করতেন। এই সময় পে-মাস্টার জেনারেল সামরিক অফিসারগণের আবেদন সম্রাটকে অবগত করাতেন এবং সম্রাটের আদেশ লাভ করতেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত এবং বিভিন্ন প্রদেশে বা পদে নিযুক্ত অফিসারগণ তাঁদের স্ব স্ব বিভাগের প্রধান কর্তৃক সম্রাটের সম্মুখে নীত হতেন। তারপর সম্রাটের ব্যক্তিগত ধনাগার বা রাজকীয় ভূমি বিভাগের কেরানী তাদের বিভাগীয় প্রধানের মারফত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্রাটের নিকট পেশ করতেন এবং আদেশপ্রাপ্ত হতেন। এ সব কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সম্রাটের বিশিষ্ট কর্মচারীগণ, যুবরাজ, গভর্নর এবং অন্যান্য প্রাদেশিক অফিসারের নিকট প্রেরিতব্য নির্দেশাবলী এবং সম্রাটের কাছে প্রেরিত নয়রানা সম্রাটের নিকট পেশ করতেন। যুবরাজ এবং প্রধান অফিসারদের নিকট প্রেরিতব্য পত্রাবলী সম্রাট নিজে পড়তেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব পত্রের বক্তব্য সম্রাটকে বুঝিয়ে দেওয়া হত। এসব কাজ শেষ হলে প্রধান সদর প্রাদেশিক সদরগণের নিকট প্রেরিতব্য নির্দেশসমূহের প্রধান প্রধান অংশ সম্রাটকে শোনাতেন। এরপর তিনি অভাবগ্রস্ত সৈয়দ, শেখ, ধার্মিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং তাদের জন্য অর্থ মঞ্জুরী লাভ করতেন।

এরপর পূর্বে মঞ্জুরীকৃত মনসব, জায়গীর, নগদ অর্থ প্রদান এবং অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ দ্বিতীয়বার সম্রাটের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হত। তৎপর রাজকীয় আস্তাবলের অফিসারগণ সম্রাটের সম্মুখ দিয়ে রাজকীয় ঘোড়া এবং হাতী সারিবদ্ধভাবে নিয়ে যেতেন। এ সব ঘোড়া এবং হাতীকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করা

২৬. Sir W. H. Sleeman, A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849-50, p. 66-67. Quoted from Foundations of Local self-Government in India. Pakistan and Burma, Hugh Tinker, p. 20

হচ্ছে কি না বা তাদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ চুরি করা হচ্ছে কি না তা সম্রাটকে অবগত করার জন্য এই ব্যবস্থা পালন করা হত।

এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সম্রাট তাঁর শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ও কতিপয় নির্ধারিত ব্যক্তির সাথে দেওয়ান-ই-খাস-এ মিলিত হতেন এবং গোপনীয় কার্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। গুরুত্বপূর্ণ পত্রের জবাব এবং নির্দেশসমূহ এখানে সম্রাটের মৌখিক নির্দেশ মতাবিক লিখিত হত। এরপর শীর্ষস্থানীয় রাজস্ব অফিসারগণ রাজকীয় ভূমি সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ সম্রাটের গোচরীভূত করতেন। এ সময় সরকারী বৃত্তি ও দান গ্রহণকারীদের সম্পর্কেও সম্রাটকে অবহিত করতে হত। তারপর নিপুণ শিল্পী, স্বর্ণকার এবং নির্মিতব্য রাজকীয় প্রাসাদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হত।

প্রয়োজন অনুসারে এ ব্যাপারে একটা গোপন অধিবেশন বসত। এই অধিবেশনে একমাত্র উজির এবং কখনও কখনও এক কিংবা দু'জন আমন্ত্রিত অফিসার যোগদান করতে পারতেন। প্রয়োজনবোধে বিকাল তিনটার পর একটা দরবার বসত। সভাসদ এবং উক্ত রাত্রির গার্ডগণ সম্রাটকে নৈশকালীন সালাম প্রদান করতেন।

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর পর সম্রাট দেওয়ান-ই-খাস-এ বসতেন। সম্রাট শাহ-জাহান তাঁর পছন্দমত মন্ত্রীসহ প্রায় দু'ঘন্টা কাটাতেন। এই সময় তিনি প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং আমোদ-প্রমোদে কাটাতেন। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত। জাহাঙ্গীরের দরবারে নাচ-গান হত না। তিনি শুধু রাজকীয় কাজ করতেন। উজির অর্থ বিভাগ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতেন এবং সম্রাটের আদেশ লাভ করতেন। অন্যান্য রাজকীয় কাজও এই সময় সম্পন্ন করা হত।

দৈনন্দিন এই কাজ সপ্তাহের তিন দিন যথা—বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে পরিবর্তিত হত। শুক্রবার ছিল সাপ্তাহিক নামাযের দিন এবং ছুটির দিন। বৃহস্পতিবার ছিল অর্ধদিবস ছুটি এবং বুধবার ছিল ন্যায়বিচারের দিন। এইদিন সম্রাট দেওয়ান-ই-খাস-এ বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন।^{২৭}

ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট কিভাবে বিচার করতেন

শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব বুধবার দিন বিচার করতেন। সম্রাট সরাসরি 'দর্শন জানালা' থেকে দেওয়ান-ই-খাস-এ সকাল আটটার সময় আসতেন এবং বিচারের আসনে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বসে থাকতেন। ঘরটিতে রাজকীয় আইন অফিসার, কাযী, আদিল, মুফতি, উলামা, ফতোয়া প্রদানকারী, আদালতের তত্ত্বাবধায়ক এবং কোত-ওয়াল সবাই উপস্থিত থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে সভাসদগণের আর কেউ তথায় অবস্থান করতে পারতেন না। জনৈক অফিসার একে একে বাদীদেরকে উপস্থিত করতেন এবং তাদের অসুবিধাসমূহ রিপোর্ট করতেন। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সম্রাট

ঘটনার সত্যতা যাচাই করতেন, উলামার নিকট থেকে আইন সম্পর্কে জেনে নিতেন এবং সেই মতাবিক রায় দিতেন। অনেকে দূরবর্তী প্রদেশ থেকে বিচারের আশায় আসতেন। তাদের ব্যাপারটি তখন তদন্ত করা যেত না। এসব ক্ষেত্রে সম্রাট সেই সব এলাকার গভর্নরগণকে সত্য উদঘাটনে তদন্ত করে বিচার করার বা রিপোর্টসহ পক্ষদ্বয়কে বিচারের জন্য পুনরায় রাজধানীতে পাঠাবার নির্দেশ দিতেন।

প্রাথমিক ইউরোপীয় সফরকারীগণ মোগল যুগের বিচার বিভাগীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উইলিয়াম ফিন্চ (William Finch) ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে লেখেন : “আখা দুর্গের চারটি গেট ছিল। পশ্চিমে বাজারের দিকের গেটটিকে বলা হত কাছারী গেট। এই গেটের মধ্যে প্রধান বিচারকের আসন ছিল। আসনের অপর দিকে কাছারী। এখানে সম্রাটের উজির প্রতিদিন সকালে তিন ঘণ্টা ধরে বসতেন সম্রাট বিচার করতেন এবং প্রাণদণ্ড প্রত্যক্ষ করতেন (এই শাস্তি দর্শন বারান্দার নীচে নদীর তীরে প্রদান করা হত)।”^{২৮}

পাঁচ বছর পর টেরী (Terry) লিখেছেন : “...খুব তাড়াতাড়ি বিচার করা হত, শাস্তি প্রদানও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হত। প্রদেশ ও শহরের গভর্নরগণ একই নিয়মে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। তাদের কাছে কোন আইন লিখিত আছে বলে আমি শুনি নি। সম্রাট ও তাঁর বিকল্পের ইচ্ছাই আইন।”^{২৯}

প্রত্যক্ষদর্শী বারনিয়ার আওরঙ্গজেবের বিচার পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে দিয়েছেন : “সাধারণ হল ঘর থেকে সমস্ত দরখাস্ত এক সাথে সম্রাটের নিকট এনে তাঁকে একে একে পড়ে শোনানো হত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সম্রাটের সম্মুখে হাযির করা হত এবং সম্রাট নিজে তাকে জেরা করতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার অভিযোগের বিচার করা হত। সপ্তাহের আর একদিন দু’ঘণ্টা যাবত সম্রাট নিম্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশ দেয়া মামলার মধ্য থেকে দশটি মামলা সম্পর্কে মতামত জানাতেন। দু’জন কাযীসহ সপ্তাহের অপর একদিন আদালতখানায় যেতে সম্রাট কোনদিন অপারগ হতেন না।”^{৩০}

রাজকীয় বিচারকার্য সম্পাদন সম্পর্কে Manucci লিখেছেন : “দিওয়ান-ই-আম-এ হাযির হয়ে সম্রাট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ শুনতেন। কেউ কেউ হত্যা-কারীর বিরুদ্ধে শাস্তি দাবি করতেন, কেউ কেউ অবিচার বা বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে অভিযোগ করতেন। সম্রাট রাগান্বিত হতেনরাগস্বরে বলতেন যে, চোরদের মাথা কেটে দেওয়া দরকার, লুণ্ঠিত পথিককে গভর্নর ও ফৌজদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে

২৮. যদুনাথ সরকার, Mughal Administration.

২৯. ঐ

৩০. ঐ

হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করতেন অপরাধীর ক্ষমা নেই ... কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঘটনার সত্যতা যাঁচাই করে তাঁর কাছে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।”^{৩১}

মোগল বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ দিকটা হল, কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। উচ্চ থেকে নিম্ন আদালতের কোন পদ্ধতিগত নিয়ম বা সংগঠন ছিল না বা এলাকাভিত্তিক কোন আদালত ছিল না।

সম্রাট বাবর

সম্রাট বাবর ছিলেন ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা ওমর শেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার ফরগনা রাজ্যের রাজা ছিলেন। ওমর শেখ ছিলেন তৈমুর লঙ্গের ষষ্ঠ বংশধর এবং বাবরের মাতা মোগল বংশীয় চেঙ্গিজ খাঁর বংশ-সম্ভূতা। এজন্য বাবরের বংশ মোগল বংশ নামে খ্যাত। বাল্যকাল থেকে বাবর সাহসী ও সমরপ্রিয় ছিলেন। বার বছর বয়সের সময় পিতৃ রাজ্য অধিকার করার তিন বছর পর তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তিনি রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান। তেইশ বছর বয়সে তিনি কাবুল অধিকার করেন। এ সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন পাঠান রাজ ইব্রাহিম খাঁ লোদী এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন দৌলত খাঁ। দৌলত খাঁ দিল্লীর সিংহাসন লাভের আশায় বাবরকে আমন্ত্রণ জানান। বাবর সসৈন্যে ভারতভিमुखে যাত্রা করেন এবং পাঞ্জাবে উপস্থিত হয়ে দৌলত খাঁকে বন্দী করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে বাবর পাঠানদের পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এরপর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর সংগ্রাম সিংহকে ফতেপুর সিক্রি নামক স্থানে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। এভাবে অভ্যন্তরীণ শত্রু পরাজিত করে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েকটি প্রদেশ জয় করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, চমৎকার হস্তলিপিকুশলী এবং ভূগোল ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ সেনাপতি ও সুকৌশলী যুদ্ধ পরিচালক। পুত্র বংশল পিতা, দয়ালু প্রভু এবং মহৎ বন্ধু হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বাবর ও শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের' সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিখ

১. গুরু নানক আধুনিক শিখ ধর্মের প্রবর্তক। পাকিস্তানের লাহোর নগরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে তালবস্তী (বর্তমান নানকানা) গ্রামে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূমধ্যাকারীর পাটওয়ারীর কাজ করতেন। কুলপুরোহিত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ হরদয়াল এই শিশুর ভবিষ্যৎ মহত্ব গণনা করে নানক নামকরণ করেন। নানক বাল্যকালে অতি শান্ত স্বভাবের ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং কুতুবুদ্দীন মোল্লার নিকট ফারসী ও উর্দুভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর নিয়ে অতি

ঐতিহাসিকগণ চমকপ্রদ এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, দু'বার ভারত আক্রমণে বিফল হয়ে বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দিল্লী অভি-
যুখে যাত্রা করেন। পাঞ্জাবের ছোট শহর এমিনাবাদে পৌঁছালে তাঁর সম্মুখে বেশ
কয়েকজন বন্দীকে হাযির করা হয়। বন্দীদের মধ্যে একজনের প্রতি নয়র পড়তেই
বাবর তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর মন্ত্রীকে তুরানীয়ান ভাষায় বিস্ময়
প্রকাশ করে বলেন, “কি ব্যাপার! গজনীতে অবস্থান করার সময় যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখা
দিয়ে আমাকে তৃতীয়বার ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান এবং বিজয়ের সুসংবাদ
দেন, সেই পবিত্র মানুষকে এখন আমি স্বশরীরে দেখতে পাচ্ছি।” এই পবিত্র ব্যক্তিই
গুরু নানক। বাবর তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করেন এবং তাঁকে এমন ইচ্ছা
প্রকাশ করতে আবেদন জানান যা তিনি (বাবর) পূরণ করতে পারেন। গুরু নানক
বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়।^২

বিজয়ীর বেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করার পর সম্রাট বাবর পাঠান রাজাদের
অনুসৃত প্রশাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। তাঁর পাঁচ বছরের স্বল্পকালীন রাজত্বকালে
তিনি সরকার পরিচালনার জন্য কোন নয়া পদ্ধতি চালু করেন নি। অধিকাংশ সময়ই
তাঁকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল এবং দেশ শাসনের ব্যাপারে
অনুরক্ত জেনারেলদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তিনি এত কম সময় রাজত্ব

মনোহর বৈরাগ্যব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করেন। নয় বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। ফকির
সন্ন্যাসী দেখলেই নানক সব কাজ ত্যাগ করে তাঁদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনতে
ভালবাসতেন। পুত্রকে সংসারী করার নিমিত্ত কালুবেদী তাকে একটা দোকানের ভার দেন।
কিন্তু সাধু পুরুষদের সাথে কথোপকথন করতে করতে নানক দোকানের কথা ভুলে যেতেন
এবং তাঁদেরকে যথাসর্ব্ব দান করতেন। এইজন্য তাঁর পিতা সংসারী না হলে তাকে গৃহত্যাগের
কথা বলেন। বিশ বছর বয়সের সময় নানক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সুলতানপুরে ভগ্নী নানকীর
গৃহে গমন করে তথায় একটা মুদিখানা দোকান খুলেন। এই সময় চৌনী নামী এক রমণীর
সাথে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীচন্দ ও লক্ষীদাস নামে তাঁর দুই পুত্র হয়। সাতাশ বছর বয়সের
সময় স্ত্রী-পুত্রের মায়া ছিন্ন করে তিনি সন্ন্যাসী হন। এই সময় তিনি মক্কা নগরীতেও গিয়ে-
ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ গুরুবাদী। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ নাই। সং গুরুর
আশ্রয় নিয়ে তার আদেশ মতে চললেই সত্য ধর্ম লাভ হবে-এই ছিল তাঁর উপদেশের সারমর্ম।
কথিত আছে, এক সময় নানক নদীতে স্নান করতে গিয়ে অদৃশ্য হন। তিন দিন পরে পুনরায়
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ সময় তিনি বিষ্ণু দূত কর্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হয়ে
দীক্ষিত ও পৃথিবীতে গুরু মহিমা প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। তাঁর পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক
ব্যবহার এবং সং উপদেশে অনেকে মোহিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মের বাহ্যিক
আড়ম্বর পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সাধনা করতে তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন
এবং নিজেও সেইরূপ করতেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

করেন যে একমাত্র বিজিত দেশসমূহ আয়ত্তে রাখার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি। তাঁর সময় কোন প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন বা প্রথা, কোন বিচারপদ্ধতি চালু ছিল না। সম্রাট এবং তাঁর জেনারেলগণ মাত্র কয়েকটি মামলার বিচার করেন।

গুলবদন বেগম^৪ সম্রাট বাবরের বিচার পদ্ধতির মাত্র কয়েকটা ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। এ থেকেই তাঁর বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

১. খসরু শাহের বাহিনী খান্দেশ ও বাদাখশান-এর মধ্যবর্তী এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে। খসরু শাহ বাবরের দুই চাচাত ভাই-এর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। কিন্তু সম্রাট বাবর তার প্রতিশোধ নিতে চান নি। তদুপরি খসরু শাহের প্রয়োজনমত সবকিছু সরবরাহ করারও তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।^৪

৩. সম্রাট বাবরের কন্যা। মাতার নাম দিলদার বেগম। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খোরাसानে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের মাতা মহম বেগম (সম্রাট বাবরের অপর এক স্ত্রী) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লালন-পালন ও লেখাপড়া শেখানোর ভার গ্রহণ করেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর দুখ মাতার সাথে অগ্রায় যান। অগ্রা ছিল তখন সম্রাট বাবরের প্রধান কর্মস্থল। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুলবদন বেগম ভারতে অবস্থান করেন। সম্রাট হুমায়ুন শের শাহের কাছে পরাজিত হওয়ার পর অন্যান্য রাজকীয় মহিলার সাথে তাঁকেও কাবুলে প্রেরণ করা হয়। পলাতক হুমায়ুন ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের সাথে মিলিত হন।

১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে খিদির খাজা চাগতাই-এর সাথে গুলবদন বেগমের বিয়ে হয়। খিদির খাজা ছিলেন বাবরের বোন খানজাদা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র। খিদির খাজা সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে 'আমির উল-উমরা' পদে উন্নীত হন। গুলবদন বেগমের বেশ কয়েকটি সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই প্রসিদ্ধ হতে পারেন নি।

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুলবদন বেগম হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হিজাজে সাড়ে তিন বছর কাটিয়ে তিনি চারবার হজ্জব্রত পালন করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। আসার পথে তাঁকে এডেনে এক বছর কাটাতে হয়। ভারতে ফিরে আসার পর সম্রাট আকবর তাঁকে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লেখার অনুরোধ করেন।

'হুমায়ুন নামার' ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাসমূহের একটা অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এস. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত এবং দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত পুস্তক ১৯০২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। 'হুমায়ুন নামা-ই-গুলবদন বেগম' শীর্ষক ফার্সী ভাষায় আর একটি সংস্করণ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ প্রকাশিত হয়।

তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় গুলবদন বেগম পারদর্শী ছিলেন। হস্তলিপি বিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে ৮২ বছর বয়সে গুলবদন বেগম অগ্রায় মারা যান।

৪. মুহাম্মদ আকবর, Administration of Justice by the Mughals, Quoted from Humayun-Nama (Urdu translation) by Gulbadan Begum.

২. মীর্জা খান^৫ ও মীর্জা মোহাম্মদ হোসেন বিদ্রোহ করে কাবুল অবরোধ করেন। সম্রাট অল্পদিনের মধ্যে দুর্গটি পুনরায় জয় করেন। মীর্জা খান তাঁর মায়ের বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন, কারণ তাঁর মা ছিলেন সম্রাটের চাচী। মোহাম্মদ হোসেনও তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। কারণ তাঁর স্ত্রী ছিল সম্রাটের আত্মীয়া। সম্রাট বাবর তাঁদের উভয়কেই ক্ষমা করে দেন।^৬

৫. বৈরাম খানের পুত্র।

৬. মুহাম্মদ আকবর, Administration of Justice by the Mughals.

সম্রাট হুমায়ুন

সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। পিতা বাবরের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহন করে দশ বছর রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু ক্রমে তিনি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। অবশেষে কনৌজ যুদ্ধের পর তিনি রাজ্যহারা হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে থাকেন। এ সময় তাঁর ভায়েরা তাঁকে কোন সাহায্য করেন নি। উপরন্তু কামরান তাঁর অশান্তির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যোধপুরের মালদেবের সাহায্য কামনা করেন। মালদেব তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেন নি। এরপর তিনি অমরকোট যান। অমরকোটের রানা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রানাও তাঁকে নিরাশ করেন। এ সময়ই আকবরের জন্ম হয়। এরপর তিনি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ও দুর্ভাগ্যের চরমে পৌঁছে পারস্যের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পারস্যের শাহের সাহায্যে কামরানকে পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর সব ভাইকে পরাজিত এবং দিল্লীর সিংহাসনের দাবীদার সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে দিল্লী পুনরাধিকার করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি প্রাসাদের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমায়ুন ছিলেন অমায়িক, বিদ্বান ও দয়ালু। যোগ্যতা ও সাহসেও তিনি প্রশংসার পাত্র ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, অংক-শাস্ত্র ও কবিতা ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতম দিক হলো, তিনি সহজে কর্তব্য স্থির করতে পারতেন না এবং তাঁর দৃঢ় মনোবলের অভাব ছিল। পারিবারিক জীবনে তিনি হর্ষাৎফুল্ল সঙ্গী ও সদাশ্রয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর নামের অর্থ ভাগ্যবান। কিন্তু তাঁর মত দুর্ভাগ্য সম্রাটকে ভাগ্যবান ডেকে যে ভুল করা হয়ে থাকে, এরূপ আর কোন সম্রাটের বেলায় হয়নি বলে অনেকে মনে করেন।

মৃত্যুর আগে সম্রাট হুমায়ুন বিজিত এলাকার শাসন পরিচালনার জন্য একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে যান। তিনি সরকারী কার্যাবলী চারটি ভাগে ভাগ করে চার জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন।^১ বিজিত এলাকার নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে কয়েকটি দুর্গ ছিল। সম্রাট এবং তাঁর জেনারেলগণ মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বিচারকার্য সমাধা করেন। এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো :

১. সম্রাট হুমায়ুন জানতে পারেন যে, হাজী মোহাম্মদ খান কোকীর পিতাকে হত্যা করার পর মোহাম্মদ জামান মীর্জা বিদ্রোহ করার পায়তারা করছেন। সম্রাট তাঁকে ডেকে আনার জন্য একজন লোককে পাঠান। তিনি মোহাম্মদ জামান মীর্জাকে বিয়ানা (Biana) থেকে গ্রেফতার করে ইয়াদগার তাগ্‌হাই-এর তত্ত্বাবধানে রাখেন। মোহাম্মদ জামান ইয়াদগারের লোকদের সহায়তায় পলায়ন করতে সমর্থ হন। সব কিছু অবগত হওয়ার পর সম্রাট মোহাম্মদ জামান মীর্জা ও নেখুব সুলতান মীর্জার চোখ উপড়ে ফেলার আদেশ দেন। আদেশ মুতাবিক তাদেরকে অন্ধ করে দেওয়া হয়।^২

২. মীর্জা কামরানের সাথে যুদ্ধ করার সময় সম্রাটের সৈন্যরা কামরানের সৈন্যদের পরাজিত করে এবং অনেককে বন্দী করে। সম্রাট তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করার আদেশ দেন। বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রে আদেশ কার্যকরী করা হয় এবং অনেককে বন্দী করা হয়।^৩

৩. সম্রাট যখন পারস্যে ছিলেন তখন সম্রাটের অমাত্য রওশন বেগ কোকা ও খাজা গাজী দেওয়ান এবং মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাগত মীর্জা কামরানের বর্শাধারী কর্মচারী সুলতান মুহাম্মদ পারস্যাদিপতি শাহ তামাস্পের সাথে সাক্ষাৎ করে সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে কতিপয় ভিত্তিহীন অপবাদ উত্থাপন করে। মীর্জা কামরানও স্থায়ী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম ছড়ানোর প্রয়াস পান। এ ধরনের বিরুদ্ধ প্রচারণায় সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি শাহ তামাস্পের মনোভাব বহুলাংশে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। বাহরাম মীর্জা ও শাহ তামাস্পের সহোদরা শাহ তামাস্পকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করেন এবং রওশন বেগ কোকা ও সুলতান মুহাম্মদকে বন্দী করে সাজা দেওয়ার আদেশ দেন। সাজার আদেশ হওয়ার পর রওশন বেগ সম্রাট হুমায়ুনের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করে কাতরভাবে ফরিয়াদ পেশ করেন। এ আবেদন-পত্রে বলা হয়েছিল—“পাপী ও বেতমিজ গোলাম আমরা, প্রাণভিক্ষা পাওয়ার দাবী আমরা করতে পারি না। কিন্তু তবু হুয়ুরের সুপারিশের আশ্রয় আমাদের মস্তকের ওপর বিরাজ করছে। নির্বোধ লোকেরাই অন্যায়ের অনুষ্ঠান করে, আর বাদশাগণ সে অন্যায় ক্ষমা করেন।” রওশন বেগ তাঁর আবেদনে একথাও উল্লেখ করেন যে, সম্রাট (হুমায়ুন) তাঁর জননীর দুঃখ পান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট হুমায়ুন রওশন

২. Do, Quoted from Humayun-Nama (Urdu translation) by Gulbadan Begum, p. 26.

৩. Muhammad Akbar, Administration of Justice by the Mughals, Quoted from ibid.

বেগের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শাহ তামাম্পের কাছে এক পত্র লিখে তাঁকে অনুরোধ করেন যে, পরলোকগত শাহ ইসমাইলের সমাধির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রওশন বেগের ক্ষমা করা হোক। সম্রাটের এ পত্র পাঠ করে শাহ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন—‘কি বিরাট অন্তরের অধিকারী বাদশা হুমায়ুন! এসব লোক তাঁর ধ্বংস সাধনের জন্য চেষ্টিত ছিল, আর ইনি এদের জন্যই সুপারিশ করছেন।’ শাহ অপরাধী দু’জনকে হুমায়ুনের হস্তে সমর্পণ করার আদেশ দেন। আদেশ মতই রওশন বেগ ও গাজী সুলতান মুহাম্মদকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।^৪

৪. সম্রাট হুমায়ুন গুজরাটে ‘চম্পানীর’ দুর্গ জয় করার কয়েকদিন পর গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের একজন অমাত্য সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুর্গে আগমন করেন। এই অমাত্যের নাম আলম খান। কোন কোন আমীর এ সময়ে সম্রাটকে পরামর্শ দেন যে, আলম খানের ওপর পীড়ন করা হলেই সম্ভবত সুলতান বাহাদুরের লুণ্ঠায়িত ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্রাট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে ব্যক্তি আনুগত্য প্রদর্শন করতে এগিয়ে এসেছে, তাঁর প্রতি কঠোর আচরণ কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না।^৫

৫. ভাককার শহরের সম্মুখে শিবির স্থাপন করার পর সম্রাট রওশন বেগ কোকাকে নির্দেশ দেন যে, নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলের দশ-বারো ক্রোশ অভ্যন্তরে গিয়ে সেখান থেকে কতিপয় গরু ও মহিষ সংগ্রহ করে এনে সেসব গরু-মহিষের চামড়া দিয়ে নদী পার হওয়ার উপযোগী পোশাক তৈরী করা হোক। সম্রাটের আদেশ মতই কাজ করা হলো। নদী পার হওয়ার সময় একটা নৌকাও পাওয়া গেল। তর্জী বেগ এ নৌকা দখল করে তার লোকজনকে এর সাহায্যে নদীর অপর তীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। রাজকীয় পরিবারের ‘আকা’ (কর্মাধ্যক্ষ) তখন নৌকার নিকট গিয়ে তর্জী বেগকে উদ্দেশ্য করে আদেশের ভঙ্গীতে বলেন, “নৌকা থেকে আপনি নিজের জিনিসপত্র নামিয়ে নিন। এ নৌকা দিয়ে শাহানশাহ ও রাজকীয় পরিবারের লোকজনকে পার করা হবে।” আকা-র এ কথায় তর্জী বেগ তাকে ‘বদমায়েশ’ বলে গালি দেন। আকাও প্রত্যুত্তরে ‘বদমায়েশ’ বলে তর্জী বেগকে গালি দেন। তর্জী বেগ তখন নিজের হাতের ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আকা-কে আঘাত করেন। আকা-ও তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি বের করে তা’ দিয়ে তর্জী বেগকে আঘাত করে প্রতিশোধ নেবার প্রয়াস পান। সৌভাগ্যবশত আকা-র তরবারীর এ আঘাত তর্জী বেগের ওপরে

৪. জওহর আফতাবচী, তাজকিরাতুল গুয়াকিয়াত, চৌধুরী শামসুর রহমান অনূদিত, পৃ. ৯৪, ৯৮, ৯৯।

৫. ঐ, পৃ. ৫।

না পড়ে তাঁর ঘোড়ার জীনের ওপরে গিয়ে পড়ে এবং ফলে জীনের সম্মুখের অংশ কেটে যায়। এ সময়ে লোকজন এসে দু'জনকে পৃথক করে দেয়। এ দুর্ঘটনার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে তিনি তর্জী বেগের উচ্চ মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আকা-র উভয় হস্ত একখানা রুমাল দিয়ে বেঁধে তাঁকে তর্জী বেগের সম্মুখে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মূতাবিক আকা-কে যখন হাত বাঁধা অবস্থায় তর্জী বেগের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সম্রাট অগ্রসর হয়ে স্বহস্তে তার হাতের বাঁধন খুলে দেন এবং সম্মানের সাথে তাকে নিজের পাশে বসান। তিনি আকা-কে একটি ঘোড়া এবং একটি পোশাকও উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।^৬

৬. সম্রাট হুমায়ুন একবার 'বাজোনা' নামক স্থানে কুস্তীর নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। শাহজাদা আসকরী এসে সংবাদ দেন যে, শের খান মীর ফরিদ ঘোরকে সম্রাটের পশ্চাদানুসরণের জন্য প্রেরণ করেছেন। সম্রাট তখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার আয়োজন করেন। অমাত্যবর্গসহ যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর জটনৈক মোগল সম্রাটের কাছে এসে অভিযোগ করে যে, চৌবা বাহাদুর তার অশ্ব কেড়ে নিয়েছে। অভিযোগ শুনে সম্রাট এক ব্যক্তিকে ডেকে আদেশ দেন যে, ঘোড়াটি অভিযোগকারীকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আদেশ মত চৌবা বাহাদুরকে সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে আসা হলে সম্রাট তাকে মোগলের ঘোটকটি অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করার আদেশ দেন। কিন্তু চৌবা বাহাদুর এ আদেশ মান্য করে ঘোড়া ফেরত দিতে রাষী হলো না, বরং গোঁয়ারত্বমি করতে থাকে। এ ঔদ্ধত্যের সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে তিনি চৌবার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হয় এবং চৌবা বাহাদুরের কর্তিত শির একটি বর্শাথে বিদ্ধ করে সমগ্র সেনাদলের মধ্যে প্রদর্শন করা হয় যেন কেউ রাজকীয় আদেশ অমান্য করতে সাহসী না হয় অথবা লুটতরাজে মন না দেয়।^৭

৭. কান্দাহার থেকে কাবুলের পথে 'দেহা-আফগানান' নামক স্থানের দিকে রাজকীয় বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল। এমন সময় মীর্জা কামরানের পক্ষ থেকে শের আফগান যুদ্ধার্থে এগিয়ে আসেন। এ যুদ্ধে করাচা খান শের আফগানকে বন্দী করতে সমর্থ হন। সম্রাট তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখার আদেশ দেন। করাচা খানের পরামর্শে সম্রাট তাকে হত্যার আদেশ দেন এবং আদেশ মতো তখনই তাকে হত্যা করা হয়। শের আফগানের অন্য যেসব লোক ধরা পড়ে, মীর্জা হিন্দালের অনুরোধে সম্রাট তাদের প্রাণভিক্ষা দেন।^৮

৬. জগদহর আফতাবটী, তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত, চৌধুরী শামসুর রহমান অনূদিত, পৃ. ৫১-৫২।

৭. ঐ, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮. তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত, পৃ. ১২০-১২১।

৮. একদিন জনৈক লোককে সঙ্গে করে সম্রাটের নিকট গিয়ে করাচা খান অনুরোধ করেন যে, লোকটিকে দশ তোমান (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করা হোক। সঙ্গে সঙ্গেই একটি আদেশ-পত্র লিখে লোকটিকে দশটি মুদ্রা প্রদানের জন্য সম্রাট নির্দেশ প্রদান করেন। লোকটির হস্তে আদেশ-পত্রটি প্রদান করে করাচা খান তাকে খাজা গাযীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিন্তু তহবিলে দান করার মত অর্থ না থাকায় তিনি অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। হতাশ হয়ে লোকটি তখন করাচা খানের কাছে গিয়ে আদেশ-পত্রটি ফেরত দেয়। খাজা গাযীর এ আচরণে নিজেদের অপমানিত বোধ করে করাচা খান সম্রাটের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু সম্রাট এ অভিযোগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বিক্ষুব্ধ করাচা তখন আরো কতিপয় আমীরসহ দল ত্যাগের সংকল্প করেন। সম্রাট তাঁদের বুঝাবার প্রয়াস পান কিন্তু তাঁরা মীর্জা কামরানের সাথে যোগদানের উদ্দেশ্যে দল ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর করাচা খান, মোসাহেব বেগ ও পাবুস বেগ নিজেদের তীর রাখার থলে ও তলোয়ার স্ব স্ব স্বন্ধে ঝুলিয়ে সম্রাটের সম্মুখে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সম্রাট তাঁদের অপরাধ মার্জনা করে দেন।^৯

৯. সম্রাট একবার ‘কাশাম’ নামক স্থান থেকে চার ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেন এবং এখানে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকেই তাঁর জীবন সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে ওঠেন। এ সময় রাজকীয় দলের অনেকের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয়। বিদ্রোহী ভাবাপন্ন মীর্জা আসকরীকে কৌশলে নিজের বাড়িতে নিয়ে করাচা খান তাঁকে আটক করে রাখেন। সুস্থ হয়ে মীর্জা আসকরীর এবম্বিধ আচরণের কথা জানতে পেরে সম্রাট তাঁর পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখার আদেশ দেন। কিছুদিন পর মীর্জা কামরান যখন সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন তখন সম্রাট এত খুশি হন যে, মীর্জা আসকরীর পায়ের বেড়ী খুলে দেওয়ার আদেশ দেন। এ আদেশ তখনই পালন করা হয়।^{১০}

১০. বারবার সম্রাটের বিরুদ্ধে মীর্জা কামরান উত্তেজনা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সম্রাট তাঁকে কিছুই বলেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কামরানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি কামরানকে অন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেন। তাঁর এ আদেশ যথায়থ পালিত হয়।^{১১} পরে মীর্জা কামরানকে মক্কায় গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। বন্ধু-বান্ধব এবং আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মীর্জা কামরান তাঁর স্ত্রীর

৯. তাজকিরাতুল ওয়াকিরাত, পৃ. ১২৪-১২৫।

১০. ঐ, পৃ. ১১৭ ও ১৩০।

১১. Muhammad Akbar, Administration of Justice by the Mughals.

সাথে প্রথমে সিদ্ধু এবং পরে মক্কায় যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন (১৫৫৭)।^{১২}

সুতরাং দেখা যায় যে, সম্রাট বাবর ও হুমায়ূনের আমলে যে কয়েকটি মামলার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল নেহায়েত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এ সময় নিয়মিত কোন বিচার-পদ্ধতি চালু ছিল না বলেই মনে হয়। সাধারণ লোক সম্রাটের ব্যক্তিগত বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল।

১২. Sir Richard Bean, Cambridge History of India, Vol. IV, p, age 43.

সম্রাট আকবর

আকবর ছিলেন তৃতীয় মোগল সম্রাট। তাঁর পিতার নাম হুমায়ুন এবং মাতার নাম হামিদা বেগম। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তিনি অমরকোট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। এ বছরই তাঁকে হিমুর নেতৃত্বে বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয় এবং হিমুকে তিনি পরাজিত করতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করার পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে তিনি চিতোর, কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, আহমদ নগর, বেরার, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, উদয়পুর ইত্যাদি জয় করেন। এভাবে তিনি এক বিরাট মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্ধ শতাব্দীকাল কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তিনি ছিলেন অমায়িক, মিতাচারী, অধ্যবসায়ী এবং বিদ্যোৎসাহী। যোগ্য শাসক হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সংগঠক এবং সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শাসনকালের অন্যতম প্রধান কীর্তি হলো রাজা টোডরমলের রাজস্ব প্রথা। তিনি নিজে বিদ্বান না হলেও অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞানাহরণে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস ও রাজনীতিতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি বাদ্য ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর। তিনি তাঁর উদার ও প্রশস্ত মনের সুশাসকোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠায় সফল হন। নানা দিক থেকে তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে আছে।

সম্রাট আকবর প্রায়ই বলতেন, “সম্রাটের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়বিচার।”^১ “আমি কোন অন্যায় কাজের জন্য দোষী হলে আমি তা আমার স্বকীয় বিবেচনার বিরুদ্ধেই করি। এক্ষেত্রে আমি আমার পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যদেরকে কি বলে জবাব দেব?” —একথাও তিনি বলতেন।^২

১. আইন-ই-আকবরী, আবুল ফজল, এইচ ব্রুকম্যান কর্তৃক অনূদিত, voll. III, p. 399. Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar থেকে উদ্ধৃত।

২. Jarrett's Ain, vol. III, p. 387, "Happy Sayings." Quoted from The Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar.

একজন প্রকৃত যোদ্ধা, যোগ্য শাসনকর্তা এবং বিজ্ঞ রাজীতিবিদ হিসেবে সম্রাট আকবর ছিলেন প্রসিদ্ধ। রাজ্য শাসনের ব্যাপারে বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষ। উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো সম্রাটের শুধু কথার কথা ছিল না। তৎকালীন পারিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার করার চেষ্টা করতেন।

সম্রাট আকবরের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ফাদার মনসেরেট^৩ (Father Monserrate) যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :

“মুসলমান বিধি অনুযায়ী কোন মামলা দু’জন বিচারকের সম্মুখে বিবিধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ সম্রাটের নির্দেশক্রমে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী মামলাসমূহ তাঁর সম্মুখে পরিচালিত হত। কোন দোষী ব্যক্তি বিদেষবশত যেন শাস্তি না পায় এবং অযাচিত অনুকম্পার জন্য যেন শাস্তি থেকে অব্যাহতি না পায় এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন থাকতেন। যখন তিনি নিজেই বিচার কার্য সমাধা করতেন, তখন তিনি ক্রমাগতভাবে তিনবার দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করতেন এবং তারপরই তাকে শাস্তি প্রদান করা হত।

এক অভিযানের সময় শত্রুপক্ষের বারজন পলাতক সৈনিককে গ্রেফতার করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনের ব্যাপারে আরো তদন্তের জন্য আটক রাখা হয়, কয়েকজনকে বিশ্বাসঘাতকতা ও ইচ্ছাপূর্বক স্বদল ত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঘাতক যখন তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের মধ্যে একজন সম্রাটকে একটা কথা বলার প্রার্থনা জানাল। “হে সম্রাট”, সে বলল, “আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাবেন না। কারণ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতাবান।” “ঠিক আছে”, সম্রাট বললেন, ওহে হতভাগ্য, কোন বিয়ে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ?”

“আমি সুন্দরভাবে গান গাইতে পারি।”

“গান শোনাও দেখি।”

হতভাগ্য লোকটি তখন গান গাইতে শুরু করে। তার গলার সুর এমনই বেসুরো ছিল যে উপস্থিত সকলেই মৃদু হেসে ওঠে। এমনকি সম্রাট নিজেও হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। অপরাধী লোকটা যখন উপলব্ধি করতে পারল যে, সে সুন্দরভাবে গাইতে পারছে না, তখন সে বলল, “সুন্দরভাবে গাইতে না পারার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন জাঁহাপনা! উত্তপ্ত ও ধূলিময় রাস্তার ওপর দিয়ে আপনার রক্ষীরা আমাকে এমন নৃশংসভাবে টেনে এনেছে এবং তাদের মুষ্টি দিয়ে আমাকে এমন

৩ . Commentary of Father Monserrate Pp. 209-10, quoted from The Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar.

নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে যে আমার গলার মধ্যে ধূলাবালি জমে গেছে এবং গলার স্বর ভেঙ্গে গেছে। ফলে আমি সুন্দরভাবে গাইতে পারলাম না”। সম্রাট লোকটার এই সরলতাপূর্ণ কথায় এমনই খুশি হন যে, তার অন্যান্য সঙ্গীসহ তাকে তিনি শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেন।

রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধীদেরকে হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট করে মেরে ফেলা হত, শূলে চড়ান হত অথবা ফাঁসি দেওয়া হত। স্ত্রীলোককে প্রলুব্ধকারী এবং ব্যভিচারী ব্যক্তিকে হয় গলা টিপে হত্যা করা হত অথবা ফাঁসি দেওয়া হত। ব্যভিচার এবং লাম্পটের প্রতি সম্রাটের এত বেশি ঘৃণা ছিল, যেকোন প্রকার প্রভাব বা অনুরোধের বা মুক্তিপণ দিতে স্বীকৃত হলেও সম্রাট ক্ষমা করতেন না। সদ্বংশজাত একটি ব্রাহ্মণ বালিকার ওপর ব্যভিচারের অপরাধে সম্রাট তাঁর বিবাহিত প্রধান ট্রেড কমিশনারকেও ক্ষমা করেন নি। সম্রাটের আদেশে তাকেও নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করা হয়।

বিচারের রায় মৌখিকভাবে প্রদান করা হত এবং তা লিখে রাখা হত না। সাধারণ অপরাধীকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে প্রহরায় রাখা হত—তাদেরকে বন্দীশালায় রাখা হত না। শান্তিপ্রাপ্ত যুবরাজদের গোয়ালিয়রের জেলে পাঠানো হত। সেখানে তারা আবর্জনা ও লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে ধ্বংস হয়ে যেত। সম্রাট অপরাধীদেরকে অন্যান্য সম্রাট লোকের নিকট শাস্তি প্রদানের জন্য অর্পণ করা হত। কিন্তু নীচ বংশজাত অপরাধীকে ডেচ্পাস রানারের ক্যাপটেন (Captain of the despatch runners) অথবা প্রধান ঘাতকের নিকট অর্পণ করা হত। এমনকি রাজপ্রাসাদের মধ্যে এবং সম্রাটের সম্মুখে ঘাতক শাস্তি দেওয়ার বিভিন্ন রকম সরঞ্জামসহ প্রস্তুত থাকত। সরঞ্জামগুলোর মধ্যে ছিল চামড়ার ফালি, বেত, ধারাল তামার পেরেক দিয়ে সজ্জিত ধনুক, অপরাধীর চামড়া ক্ষতবিক্ষত করার জন্য এক টুকরা মসৃণ কাঠ এবং চাবুক। কিন্তু এসব হাতিয়ার দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া হত না। শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে অপরাধীর মনে ভয় উদ্বেকের জন্যই এসব হাতিয়ার রাখা হত। একই কারণে রাজপ্রাসাদের গেটের দেওয়ালের সাথে বিভিন্ন রকমের হাতকড়ি এবং অন্যান্য লৌহ নির্মিত হাতিয়ার বুলিয়ে রাখা হত। এগুলো প্রধান ঘাতকরাই পাহারা দিতেন।

উপরের ভাষ্য থেকে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, সম্রাট আকবর মাত্র দু’প্রকারের শাস্তি প্রদান করতেন; যথা, মৃত্যু এবং অঙ্গহানি। তাঁর নিজস্ব একটা বিচার পদ্ধতি ছিল। ‘আইন-ই-আকবরী’তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।^৪

৪. Ain-e-Akbari, vol, II, translated by Jarret, Pp. 37-38 and Gladwin, p, 254, Quoted from The Administration of Justice by the Mughals by M. Akbar, p. 14.

“তিনি অবাধ্যদেরকে বারবার উপদেশ দিতে পছন্দ করতেন। যদি উপদেশে কোন কাজ না হয় তখন তাদেরকে তিরস্কার, ভয় প্রদর্শন, বন্দী, বেত মারা বা অঙ্গচ্ছেদন ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা না করে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। ন্যায়বিচারের জন্য আবেদনকারী ন্যায়বিচারের আশায় অনর্থক যেন বিলম্বিত না হয়। অনুতপ্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারও ধর্ম বা গোত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা অনুচিত।”

“বিচার বিভাগীয় তদন্তের সময় শুধু সাক্ষী এবং শপথের ওপর নির্ভর না করে তাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, মুখের বিশেষ ভাবভঙ্গী দেখে চরিত্র নির্ণয় করতে হবে এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভর না করে একাধিচিন্তে সবকিছু অনুধাবন করতে হবে।”

আইন অফিসার (Law Officer) নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আবুল ফজলের^৫ মত সম্রাটের নিজস্ব মত বলে ধরে নেওয়া যায়।

আবুল ফজল লিখেছেন^৬: “অভিযোগকারীর অভিযোগ শ্রবণ করা এবং ন্যায়-বিচার সম্পাদন করা সম্রাটের জরুরী কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও একজনের পক্ষে সব কিছু

৫. সম্রাট আকবরের তথাকথিত ‘নবরত্ন’ সভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, রাষ্ট্রনীতিবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্য-শিল্পী। তিনি আকবরের পরম বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি শেখ মুবারকের পুত্র ও কবি ফৈযীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা ‘আরব দেশীয় মাতা পারসিক। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে আত্রা নগরে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ও ফারসী ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকবরের দরবারে গৃহীত হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে আহমদ নগর ও আমির গড় দুর্গের পতন সাধনে এবং আহমদ নগর, বেরার ও খান্দেশ সুবাত্রয়ের শাসনকার্যে আবুল ফজলের কুটবুদ্ধি ও শাসন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে শাহাযাদা সেলিমের (জাহাঙ্গীর) বিদ্রোহ দমনকালে তিনি ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে প্রাণ হারান। মতান্তরে শাহাযাদা সেলিম উচগার রাজা বীরসিংহকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করে তাঁর দ্বারা আবুল ফজলের প্রাণ বধ করান (১৬০২)। আবুল ফজল অতি সুলেখক ছিলেন। তাঁর রচিত ‘আকবরনামা’ ‘আইন-ই-আকবরী’, ‘ইয়ার-ই-দানিক’ ও ‘পত্রাবলী’ (২য় খণ্ড) তাঁর বিরাট প্রতিভার অক্ষয়কীর্তি। কর্মবীর, উচ্চাভিলাষী ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আবুল ফজল স্বীয় যোগ্যতায় পাঁচ হাজারী মনসবদারিতে উন্নীত হন। অনেকের মতে, তাঁরই উপদেশে আকবর নতুন ইলাহী ধর্মের প্রচার করেন। আবার অনেকের মতে এই সূফী মতবাদী পণ্ডিত ব্যক্তি আকবরের ইলাহী ধর্মকে অন্তর দিয়ে সমর্থন করতেন কিনা সন্দেহ।

৬. Ain-e-Akbari, translated by Gladwin, p. 300. Quoted from the Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar, p. 15.

সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয় বিধায় তাঁর ক্ষমতা অবশ্যই অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

“শুধুমাত্র সাক্ষী এবং শপথনামায় সন্তুষ্ট হলে চলবে না, তদন্তের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কারণ শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান এবং পুজ্ঞানুপুজ্ঞ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া সত্য উদ্ঘাটন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মানব চরিত্রের প্রকৃতি এমনই যে, শুধুমাত্র সাক্ষীর জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করলে চলবে না। নিরপেক্ষ ও ধনলিপ্সার উর্ধ্বে থেকে তাকে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। যখন সত্য উদ্ঘাটিত হবে তখন তাকে সেই মুতাবিক কাজ করতে হবে, ঘটনা সম্পর্কে তাকে পুজ্ঞানুপুজ্ঞরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই অনুযায়ী তাকে বিচার করতে হবে। তাকে অবশ্যই প্রত্যেক সাক্ষীকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। সত্য উদ্ঘাটনে তাকে অবশ্যই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে ঘটনা সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে সত্য ও অসত্যের মধ্য থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে হবে।”

আবুল ফজল তাঁর আকবরনামা গ্রন্থে আরও লিখেছেন, “মহামান্য সম্রাট তাঁর দরবারে আত্মীয় এবং একজন পথিক, কোন প্রধান বা প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ ভিক্ষুকের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।”

সম্রাট আকবর দয়ালু ছিলেন। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এই জন্য তিনি পূর্ববর্তী শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি দানও বাতিল করে দেন। খন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর ‘বাংলার মুসলমান’ পুস্তকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন :

“অন্যান্য দণ্ডের মত সদরদের (সদর-ই-জাহান বা সদর-ই-কুল বা সদর-ই-সুদুর ইত্যাদি) দণ্ডেরও ব্যাপকভাবে ঘুম গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন স্বত্বাধিকারীর ফরমানে যে পরিমাণ ভূমির উল্লেখ থাকত তার সঙ্গে উক্ত স্বত্বাধিকারীর অধিকৃত প্রকৃত ভূমির পরিমাণের পার্থক্য ছিল বিস্তর। অথবা ফরমানের ভাষা এমনই দ্ব্যর্থকভাবে লেখা হত যে, স্বত্বাধিকারী ইচ্ছে করলে আরো বেশি ভূমির অধিকার ভোগ করতে পারতেন এবং তিনি যতদিন পর্যন্ত কাষী এবং প্রাদেশিক সদরকে ঘুম দিতেন ততদিন পর্যন্ত সেই অতিরিক্ত ভূমি তাঁর অধিকারে রাখতে পারতেন। এ কারণেই পুনঃ পুনঃ তদন্তের পর সম্রাট আকবর যে পূর্ববর্তী শাসকদের প্রদত্ত দানগুলো বাতিল করেছেন তা ছিল যুক্তিসঙ্গত।”^৭

প্রশাসনের এই সমস্ত দিকেও সম্রাট আকবর যে দৃষ্টি দিতেন, উপরিউক্ত ঘটনাটি তাঁর প্রমাণ। তবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে তিনি বারবার চিন্তা করতেন।

বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ নির্দেশ পাঠাতেন। গুজরাটের গভর্নরের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা, চাবুক মারা এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। তাছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করার নির্দেশ এবং মারাত্মক রাজদ্রোহের অপরাধের ক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করে তাঁর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।^৮

সম্রাট তাঁর প্রাত্যহিক জীবন যেভাবে কাটাতেন তার বিস্তারিত বিবরণ আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে। প্রতিদিন তিনি অভিযোগকারীদের অভিযোগ শ্রবণ এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।

“.....তিনি প্রায়ই দৌলতখানার পাশে এসে কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই অভিযোগ-কারীর অভিযোগনামা গ্রহণ করতেন এবং বিচার কার্য সম্পাদন করতেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি দু'বার সকলের সামনে দেখা দিতেন। প্রাতঃকালীন ইবাদতের পর তিনি ঝরোকা (Jharoka) থেকে সর্বস্তরের মানুষের সামনে উপস্থিত হতেন। সাধারণত এ সময় তাঁর কাছে আবেদন পত্র পেশ করা হত।তিনি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজের সুখের মত প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কোন ঘটনা শ্রবণ করার সময় তিনি বিরক্ত হতেন না। এই উন্মুক্ত দরবারে আইন বিভাগের অফিসারগণও তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতেন”^৯

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি আকবর ন্যায়বিচার করতেন বলেই জনগণের নিকট তিনি এত প্রিয় ছিলেন। তাঁর আদালত শুধুমাত্র উচ্চতম আপীল আদালতই ছিল না—প্রাথমিক পর্যায়ের আদালতও ছিল। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গর্ববোধ করতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অন্ত্যন্ত প্রখর। তাই ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সমস্ত মামলার বিচার করেছেন তা সত্যিকারভাবে সফল হয়েছে।^{১০}

Elliot সম্রাট আকবরের বিচারের কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন :

১. মহাম আনগার কনিষ্ঠ পুত্র আধম খান^{১১} আতকা খানের^{১২} প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। খান-ই-খানান মুনিম খানও একই মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি তাঁর এই

৮. Muhammad Akbar, The Administration of Justice by the Mughals.

৯. Ain-e-Akbari, translated by Gladwin, p. 165, Quoted from The Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar, p. 16-17.

১০. Vincent Smith, Akbar the Great Mughal. p. 315.

১১. আধম খান (মৃত্যু ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে) আকবরের সেনাপতি ও তাঁর ধাত্রীমাতা মহাম আনগার পুত্র। সম্রাটের অভিভাবক বৈরাম খানের পতনের ষড়যন্ত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ

মনোভাব এমনভাবে ব্যক্ত করতেন যে, কোন নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীর পক্ষেও তা করা সম্ভব ছিল না। তিনি আধম খানকে আতকা খানের বিরুদ্ধে উৎসাহ দিতেন এবং উত্তেজিত করতেন। অবশেষে ১২ই রমযান চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে যায়। মুনিম খান^{১০}, আতকা খান, শাহাবুদ্দিন আহম্মদ খান এবং অন্য সভাসদগণ রাজকীয় দরবার হলে বসে সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এমন সময় আধম খান একদল দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকসহ উক্ত হলে প্রবেশ করেন। খুসাম উজবেক ও তার দলের অন্যান্য লোকের প্রতি আধম খান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে খুসাম উজবেক ছোঁরা বের করে আতকা খানের বুকে আঘাত করে। আতকা খান তৎক্ষণাৎ মেঝেতে পড়ে গিয়ে মারা যান। হত্যাকারী তখন সম্রাটের নিজস্ব ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় সম্রাট ঘুমাচ্ছিলেন। কিন্তু গোলমালে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সবকিছু জানতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত রেগে যান। অকৃতজ্ঞ হত্যাকারী সম্পর্কে তিনি সামান্য চিন্তা করে তাকে অন্ধ করে দেওয়ার জন্য ফরহাত খান ও সংখ্যাম হোসনাকে আদেশ দেন। অন্ধ করার পর তাকে দুর্গের উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করারও আদেশ দেন।

লোকগুলো তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যা করা উচিত ছিল তা না করে তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় রেখে দেয়। তখন তাদেরকে পুনরায় নীচে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং তারা তাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে বিশেষ সাবধানতার সাথে নীচে নিক্ষেপ করে। ফলে হত্যাকারীর ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং তার মগজ ছিটকে পড়ে। এভাবেই অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি পায়।

২. সন্ধ্যার সময় সম্রাট বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইবাদত করতেন। সম্রাটের ভৃত্য ও সভাসদগণও এই সময় নিজ নিজ কাজ করতেন। সম্রাটের আগমনের সময় হলে তাঁরা পুনরায় একত্রিত হতেন। একদিন সম্রাট দক্ষিণাত্যের সংবাদ শোনার জন্য সন্ধ্যাকালীন ইবাদত থেকে তাড়াতাড়ি উঠে আসেন। রাজসিংহাসন ও আরাম কেদারার নিকটবর্তী হয়ে তিনি দেখতে পান যে, আলো জ্বালানোর কাজে নিযুক্ত লোকটা রাজকীয় আরাম কেদারার নিকট সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে

করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মালব অভিযানে তিনি অধিনায়কত্ব করেন। পরে মালবের ব্যবস্থাপনায় অযোগ্যতা প্রদর্শন করায় অপসারিত হন। আকবর কর্তৃক মন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত শামসুদ্দীন আতকাকে হত্যা করায় সম্রাটের নির্দেশে তাকে দুর্গ প্রাকার থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। তাঁর শোকে মাতা মাহম আনগার ৪০ দিন পর মারা যান।

১২. আমীর এবং উকিল পদে উন্নীত হন। আধম খানের হাতে নিহত হন।

১৩. হুমায়ূনের একজন মহা-আমীর ও কাবুলের গভর্নর। চৌদ্দ বছর ধরে তিনি প্রধান সেনাপতি ও আমীর-উল-উমরার পদ অলংকৃত করেন।

রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সম্রাট সাংঘাতিকভাবে ক্ষেপে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ লোকটাকে চুড়া থেকে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। তাঁর আদেশ যথাযথ পালিত হয়। ফলে লোকটার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এসব কাজ যে নিষ্ঠুর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিবেকের তাড়নায় সম্রাট এ ধরনের নিষ্ঠুর কাজ অনেক করেছেন। যেমন, অমার্জিত আচরণের জন্য তিনি হামজাবনের জিহ্বা কেটে ফেলার আদেশ দেন। একই অপরাধের জন্য খবজা ভুলের জিহ্বাও কেটে ফেলা হয়।^{১৪} জৈনিক মহিলাকে ধর্ষণ করার অপরাধে কাশিম নামে এক ব্যক্তিকে খোজা করে দেওয়া হয়।^{১৫}

সম্রাটের ব্যক্তিগতভাবে বিচার করার আরও কতিপয় ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. নরসিংহকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি রায়-ই-রাযানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে নরসিংহ পলায়ন করেন। এ সংবাদ সম্রাটকে যথাসময়ে অবগত করান হয়। উত্তেজিত সম্রাট নরসিংহের পলায়নের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য শেখ ফরিদকে নিয়োজিত করেন।

এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট রাষ্ট্রীয় কাজে তাড়াহুড়া করে কিছু করতেন না। বরং প্রকৃত তথ্য জানার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

২. জৈনিক চিতা বাঘ রক্ষককে শাস্তি দিয়ে সম্রাট একটা জেলার মানুষকে সান্ত্বনা দেন। চিতাবনের জৈনিক অধিবাসী একজন লোকের এক জোড়া জুতা জোর করে ছিনিয়ে নেয়। জুতার মালিক এতে দুঃখিত হয় এবং তার এই বিলাপ ঘটনাক্রমে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। সম্রাট তৎক্ষণাৎ জুতা অপহরণকারীকে থেফতার করে তাঁর সম্মুখে হাযির করার আদেশ দেন। তার পা দুটো কেটে ফেলারও আদেশ দেওয়া হয়।^{১৬}

৩. আবুল মা'লি বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেন। তাঁকে অবশ্য থেফতার করা হয়। কিন্তু সম্রাটের ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁর রাজত্বের শুরুতেই উৎপীড়নমূলক কোন কাজ সংঘটিত হোক। তাই তাঁকে তিনি শুধু বন্দী করে রাখার আদেশ দেন।

৪. বৈরাম খান^{১৭} সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বৈরাম খান অনুতপ্ত হয়ে জামাল

১৪. আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; মুহাম্মদ আকবর রচিত The Administration of Justice by the Mughals থেকে উদ্ধৃত।

১৫. ঐ, পৃ. ৭৩৩।

১৬. Administration of Justice by the Mughals থেকে উদ্ধৃত।

১৭. সম্রাট আকবরের অভিভাবক পদে নিযুক্ত হন। বাদশাহ হুমায়ুনের সময় তিনি 'আমীর-উল-উমরা' পদে উন্নীত হন।

খান নামে একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের মারফত তাঁকে ক্ষমা করার জন্য সম্রাটের নিকট অনুরোধ জানান। জামাল খান তাঁর আবেদন সম্রাটের নিকট পেশ করলে সম্রাট তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

৫. ‘মীর বকশী’ ও ‘মীর আরজ’ পদে অধিষ্ঠিত লসকর খান মাতাল অবস্থায় আদালতে উপস্থিত হয়ে গোলমাল শুরু করে দেন। সম্রাট তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং অন্য সবাইকে সতর্ক করার জন্য তাঁকে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর আদেশ দেন। অবশেষে তাঁকে বন্দী করা হয়।^{১৮}

৬. আমীর তুজাক শাহবাজ খানের সাথে বাবা খান কাসাল তুর্ক একটা মিছিলের আয়োজন করার সময় দুর্ব্যবহার করেন। সম্রাট এ খবর পাওয়ার পর তাঁকে এমন শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন যেন ভবিষ্যতে আর কেউ অনুরূপ দুর্ব্যবহার করতে সাহস না পায়।^{১৯}

ডিনসেন্ট স্মিথ তাঁর ‘আকবর দি গ্রেট মুগল’ পুস্তকে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে সম্রাট আকবর অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য গোপন হত্যার আশ্রয় নেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়রে আকবরের চাচাত ভাই (কামরানের পুত্র)-এর গোপন হত্যা।

২. মক্কা থেকে ফেরার পর মখদম-উল-মুলক ও শেখ আবদুন-নবীর রহস্যজনক মৃত্যু।

৩. ফারান খুদির রহস্যজনক মৃত্যু।

৪. মুইজ্জুল মুলক ও অপর এক ব্যক্তির মৃত্যু।

৫. “যে সকল মোল্লার বিরুদ্ধে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, তাদের সকলকেই একে একে ধ্বংস সাধন।”^{২০}

১৮. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত আকবরনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৯।

১৯. ঐ।

২০. বদাউনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৫, মুহাম্মদ আকবর রচিত Administration of Justice by the Mughals থেকে উদ্ধৃত।

আবদুল কাদির বদাউনী : সম্রাট আকবরের আমলের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর পিতার নাম মুলক শাহ। তিনি ছিলেন রোহিলাখণ্ডের বদাউনের অধিবাসী। আকবরের আমলে বদাউন শহর দিল্লী সুবার একটি সরকার রূপে গঠিত হয়।

মুসলিম জাহান সম্পর্কে বদাউনী কর্তৃক লিখিত ‘তারিখ-ই-বদাউনী’ একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সম্রাট আকবর সম্পর্কে তিনি এত তীব্র সমালোচনা করেন যে, আকবরের রাজত্বকালে তা গোপন রাখতে হয়েছিল এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে

৬. রনখম্বর দুর্গে হাজী ইব্রাহীমের রহস্যজনক মৃত্যু।

যাহোক, নিরপেক্ষ বিচারের জন্য সম্রাট আকবর বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর ২৪তম বছর রাজত্বকালে তাঁর বাল্য সাথী ও প্রিয় গভর্নর খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। মীর্জা কোকা গুজরাটের গভর্নর থাকা অবস্থায় তহবিল তসরুফের দায়ে আমীল আলাউদ্দিনকে গ্রেফতার করে তিনি তাকে তাঁর এক ভৃত্যের হাতে সোপর্দ করেন। আমীল আলাউদ্দিনের প্রতি উক্ত ভৃত্যের আক্রোশ ছিল, তাই সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। ফলে আমীল আলাউদ্দিন মারা যায়। মীর্জা কোকা ভৃত্যের এই কাজের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আমীল আলাউদ্দিনের পিতা পারস্য থেকে এসে সম্রাটের নিকট বিচার দাবি করেন। সম্রাট সাধারণ আদালতে মামলাটির বিচারের আদেশ দেন। খান-ই-আজম কোকা শরীয়তের আইন মূতাবিক আমীল আলাউদ্দিনের পিতাকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে অপরাধমুক্ত হন। এজন্যই আবুল ফজল লিখেছেন “আদালতে সম্রাট একজন পথিক ও তাঁর আত্মীয়ের মধ্যে, একজন ভিক্ষুক ও সর্বোচ্চ ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।”

সম্রাটের রাজত্বকালের ১৮ বছরের সময় এমনই একটা ঘটনা ঘটে। গুজরাটের শক্তিশালী সামরিক প্রধান জুব্বার খান জনৈক চাপ্লেজ খানকে হত্যা করেন। গুজরাটে অবস্থান করার সময় চাপ্লেজ খানের মাতা সম্রাট আকবরকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত করান। তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে আকবর তাঁকে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ দেন।

সম্রাট আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কাষী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এই মর্মে এক নির্দেশ জারি করেন যে, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্রাটের অনুমতি নিতে হবে। সম্রাট নিজেই যখন বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তখন তৃতীয়বার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হতো না।

ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সম্রাট আকবরের ন্যায়বিচারের প্রতি যে আগ্রহ ছিল তা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, “সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ কাজ নম্রতা ও নিরপেক্ষভাবে করা উচিত।”

তা প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থে সম্রাট আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচিত অধ্যায় ব্লকম্যান (Blockman) কর্তৃক অনূদিত হয়েছে।

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে বদাউনী সম্রাটের সভাসদ হিসাবে যোগদান করেন। সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিনি সেনাপতি আসফ খানের সাথে হলদিঘাটের যুদ্ধে যোগ দেন এবং অনেক কষ্টে তিনি যুদ্ধের বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই যুদ্ধে সেনাপতি মানসিংহের নিকট থেকে বার্তা নিয়ে সম্রাটকে প্রদান করতেন। সম্রাটের আদেশে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন চতুর্থ মোগল সম্রাট। পিতা আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর তিনি আবুল মোজাফফর নূরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গায়ী নাম গ্রহণ করে আত্মার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬০৫)। তিনি মাত্র নয় বছর বয়সে দশ হাজার সৈন্যের মনসবদার ও ষোল বছর বয়সে বার হাজার সৈন্যের মনসবদার হন। সুপুরুষ ও সুঠাম দেহের অধিকারী জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, দয়ালু এবং অত্যন্ত সাহসী। তিনি ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর রাজত্বের সতের বছরের ঘটনা আত্মজীবনী ‘তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী’তে নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। ফুল, পাখি, বাগান তাঁর অতি প্রিয় ছিল। তাঁর সময়ে মোগল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অম্বর রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মেহেরুননিসাকে (পরে নূরজাহান নামে খ্যাত) বিয়ে করেন। প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে তিনি আত্মা দুর্গের স্বীয় খাস কামরায় রক্ষিত এক তোড়া ঘণ্টার সাথে একটা স্বর্ণ-শৃংখল প্রাসাদের বাইরে স্থাপন করেন। মহাবত খানের হাতে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি কাশ্মীর গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। লাহোরের অদূরে ইরাবতী (রাবী) নদীর তীরে শাহদারায় তাঁর সমাধি সৌধ বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্তুগীজ বণিকেরাই সর্বপ্রথম আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে তামাকের আমদানি করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়বিচারের অনুরাগী। প্রকাশ্যে প্রত্যহ ন্যায়বিচার পরিচালনাকে তিনি তাঁর একটা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন।^১ তাঁর রাজ্যের সবাই যেন ন্যায়বিচার পেতে পারে, তাঁর জন্য তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আত্মজীবনীতে জাহাঙ্গীর লিখেছেন :

“পূর্ব পুরুষের সিংহাসনে উপবেশন করে যে নির্দেশ আমি জারি করলাম তা ন্যায় শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত। ঐ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত আত্মা দুর্গের সচ্ছিদ্র প্রাচীরের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো, অন্য প্রান্ত যমুনা নদীর পাড়ে একটি প্রস্তর স্তম্ভের সঙ্গে। আমার সাম্রাজ্যের কোন অংশের বিচারকগণ যদি সুবিচার করতে অসমর্থ বা ব্যর্থ হন, তবে

ফরিয়াদী ন্যায়বিচারের জন্য এই শৃঙ্খল ধরে টানলেই সুবিচার পাওয়ার পথ পাবে। শৃঙ্খলটি সোনার তৈরী, একশো চল্লিশ গজ লম্বা, তার বিভিন্ন জায়গায় আশিটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলটির হিন্দুস্তানী মানে ষাট মণ ওজন, ইরাকের ছয়শো মণের সমান।”^২

এই সোনার শৃঙ্খলটি সম্পর্কে একটা কৌতুকপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদা একটা গাধা নদীর ধারে চলতে চলতে হঠাৎ উক্ত শৃঙ্খলটিতে আঘাত করে। অনতিবিলম্বে তদন্ত করে দেখা গেল, গাধাটির মালিক অত্যন্ত কৃপণ এবং সে গাধাটিকে ভালমত যত্ন করে না। লোকটাকে সাবধান করে দেওয়া হয়।^৩

সিংহাসনে আরোহণ করার পর সম্রাট জাহাঙ্গীর বারোটি বিশেষ বিধি জারি করেন। এই বিধিগুলো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারী যেন তাদের আচরণবিধি হিসাবে যথাযথ পালন করে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিধিগুলো নিম্নরূপঃ^৪

১. আমি আমার প্রজাদের তিন প্রকার কর থেকে অব্যাহতি দিলাম। সে কর হচ্ছে যাকাত, সাবমোহরী ও তমগা। আমার পিতার কোষাগারে ঐ করগুলি থেকে ষোল শ’ মণ হিন্দুস্তানী ওজনের সোনা আসত।

২. আমি আদেশ জারি করলাম যে, আমার শাসনভুক্ত কোন অঞ্চলের কোন ব্যক্তির সম্পত্তি যদি কেড়ে নেওয়া হয়, সে ডাকাতি কিংবা কোন হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে হোক না কেন, ঐ জেলার অধিবাসীদের হয় সম্পত্তি ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে, নয়তো লুণ্ঠনকারীকে হাযির করতে হবে। আমি নির্দেশ দিলাম যে, যদি কোন জেলা পতিত কিংবা জনবসতি বিরল হয়ে ওঠে তাহলে সেখানে শহর তৈরি করতে হবে, জনসাধারণকে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সমস্ত রকম পস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। আমি জায়গীরদারদের আদেশ দিলাম তারা যেন এইরূপ জনবিরল অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে এবং যাত্রীদের থাকবার জন্য সরাইখানা তৈরী করে। এভাবেই জেলাটি পুনর্বীর জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং ভ্রমণকারীরা শঙ্কাহীন চিন্তে আনাগোনা করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে যেসব জেলা শাহী ইখতিয়ারভুক্ত, সেখানকার কর্মচারী ‘ক্রোড়ী’কে শাহী তহবিল থেকে এই সব কাজ করবার জন্য আমি আদেশ প্রদান করলাম।

৩. দেশের ভেতর যেসব বণিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের বাস্ত্র পেটারা কিংবা বস্তা যেন না খোলা হয়।

২. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অনুদিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar, p. 28, Quoting from the History of Jahangir as quoted by Beni Prashad, p. 111.

৪. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অনুদিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। পৃ. ৫-৯।

৪. সরকারী কর্মচারী নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যায়, সেক্ষেত্রে কাউকে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কিংবা তার সন্তান-সন্ততিদের ওপর জবরদস্তি করতে দেওয়া হবে না; কিন্তু যদি সন্তান-সন্ততি কিংবা কোন ওয়ারিশ না থাকে, সেক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি, মসজিদ ও পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হবে, যাতে করে মৃত ব্যক্তির আত্মার চিরস্থায়ী সদগতির ব্যবস্থা হয়।

৫. কোন ব্যক্তিকে মদ অথবা মাদক দ্রব্য তৈরি কিংবা বিক্রির অনুমতি দেয়া হবে না।.....

৬. আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রজার বাসভবনে কোন ব্যক্তির জোরপূর্বক প্রবেশ করা চলবে না।

৭. যে অপরাধই হোক না কেন, কোন ব্যক্তির নাক কিংবা কান কাটা চলবে না। যদি চুরির অপরাধ হয় তাহলে দোষীকে কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত করতে হবে, নয়ত কুরআন হাতে শপথ করতে হবে, ভবিষ্যতে সে যেন আর চুরি না করে।

৮. প্রজাদের জমি জোর দখল না করার জন্য ক্রোড়ী ও জায়গীরদারদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা এসব জমি নিজেদের চাষেও আনতে পারবে না। জায়গীরদার কিংবা জেলার কোন ইজারাদার নিজেদের ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না। অন্য জেলাভুক্ত মানুষ অথবা পশু প্রাণীকে জোর করে নিজের জেলাভুক্ত করতে পারবে না। বরং যে জেলার ভার তার ওপর ন্যস্ত সেই জেলার চাষাবাদের উন্নতির দিকেই তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৯. পাভুলিপিতে এই ধারাটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য; তবে মনে হয় ধারাটিতে প্রতিষেধক কিংবা অহিফেন-এর অবৈধ প্রয়োগের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের কথা উল্লেখ আছে অথবা খুব সম্ভব ঐ বিধি-নিষেধ কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তার নির্দেশ আছে।^৭

১০. সকল বড় শহরের গভর্নরদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তাঁরা যেন পীড়িতদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য হাসপাতাল কিংবা আরোগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। অসুখ হলে তাদের এখানে স্থানান্তরিত করতে হবে। রোগী সুস্থ না হওয়া অবধি সব খরচপত্র সরকারী খাজাঞ্চিখানা থেকে দেওয়া হবে। সুস্থ হয়ে উঠলে সংকট কালের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তাকে বিদায় দিতে হবে।

১১. আমার জন্মমাস রবিউল আউয়ালে গ্রামে নগরে গোশত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল এবং বছরে সমতা রেখে এক দিন নির্ধারিত হল, সেই দিন পশু জবেহ একেবারে নিষিদ্ধ হলো। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার, সেদিন আমি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলাম বলে গোশত গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো;

আর রবিবার পৃথিবী সৃষ্টির সম্মানিত দিন বলে, পশু জবেহ সঙ্গত নয়। এগার বছরেরও বেশী আমার পিতা আহারে এই সংযম পালন করে এসেছিলেন। ঐ সময়ে রবিবারে তিনি কোন মতেই গোশত গ্রহণে রাযী হতেন না। এই কারণেই ঐ দিন আমার রাজ্য জুড়ে অমন খাদ্য গ্রহণ নিষেধ করে দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করেছিলাম।

১২. আমার পিতার শাসনকালে যেসব আমীর ওমরাহ্ সম্মান ও শিরোপা পেতেন, সে সব আমি অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ জারি করলাম এবং যেসব ক্ষেত্রে যোগ্যতা পরিলক্ষিত হলো, সে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতির আদেশ দিলাম।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত বিচারকার্য সমাধা করেছেন বা আদেশ দিয়েছেন তার বিবরণ দেওয়া হল :

১. সৈয়দ খানকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ও লাহোর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করে পাঠান হয়। সৈয়দ খান ছিলেন মোগল বংশোদ্ভূত। দরবার ছেড়ে চলে যাবার পর শুটকয়েক লোক এসে সম্রাটকে জানায় যে, উক্ত নায়কটির দলে এমন কটি লোক আছে যারা নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির, গরীবদের উপর জুলুম করার ব্যাপারে তাদের প্রসিদ্ধি আছে। একথা শোনার পর জাহাঙ্গীর খোজা সাদেককে সৈয়দ খানের নিকট বলে পাঠান, “ছোট বড় সবাই আমার চোখে সমান, অতএব আমার ন্যায়প্রীতি ব্যক্তি বিশেষের জুলুমত উপেক্ষা করে যেতে পারে না।” বার্তাবাহককে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তার লোকজনদের মধ্যে কোন জবরদস্তির খবর পাওয়া গেলে তার শাস্তি হবে চরম। এই বার্তা সৈয়দ খানের নিকট পৌঁছালে তিনি খোজা সাদেকের কাছে লিখে পাঠান যে, যদি কখনও সে নিজে কিংবা তার আজ্ঞাবাহী কোন ব্যক্তি জুলুম অথবা অবিচার করে তাহলে তার মাথা কাটা যাবে।^৬

২. রূপ কাউয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি আমার পিতার একশো কুড়ি জন ক্রীতদাসকে কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে পালিয়ে গিয়েছিল। হিম্মতপুরের যুদ্ধে তাকে আবার বন্দী করা হয়েছিল। বিপুল শৌর্যবীর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও লোক হিসেবে সে ছিল পাঁড় মাতাল। তাছাড়া সারা জীবনে সে একবার না রেখেছে রোযা, না পড়েছে নামায। এসব সত্ত্বেও আমি তার অপরাধ মার্জনা করে তার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম।^৭

৩. আলাউদ্দীন নামে জনৈক কর্মচারী সম্রাট আকবরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কয়েক বছর বাদে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর সে যখন আমার সামনে এসে হাযির হল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিতার সঙ্গে বিশ্বাস-

৬. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অনূদিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ১৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ৪৩।

ঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা করার পর কোন্ মুখে সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? সে এমন বিনীত ও কাতর কণ্ঠে জবাব দিল যে, তার মিথ্যা ভাষণের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তার দুর্ভাগ্যে দয়াপ্রবণ না হয়ে পারলাম না। আমার পিতার আমলে সে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তাকে পুনর্নিয়োগ করা শুধু নয়, তাকে দু'হাজারী থেকে দু'হাজার পাঁচশো মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।^৮

৪. রাজা মানসিংহের চাচা (খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ রচিত 'তবাকাত-ই-আকবরী' পুস্তকে পিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ভগবান দাসের তিন পুত্র রামজী, বেচারাম ও শ্যামকে তাদের হীন চক্রান্তমূলক কাজের জন্য হাতীর পায়ে তাদের মাথা পিষে চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই তাদের জন্য তৈরী নরকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিশেষ করে রামজী হচ্ছে আলসে ও শয়তান প্রকৃতির লোক। যখন তার আত্মীয় রাজা মানসিংহের পুত্র পাহাড় সিংহকে এলাহাবাদে দু'হাজারী মনসবদারী দেওয়া হয়েছিল, সে সময় জঘন্যভাবে রামজী পাহাড় সিংহকে প্ররোচিত করে তার সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছিল। রামজী যখন তার চক্রান্তমূলক কাজে উদ্যত, তখনই তার হীন কাজের সে যথার্থ শাস্তি লাভ করল।^৯

৫. ঘটনাটা হচ্ছে বন্ধুত্ব বনাম কর্তব্যের দাবীর দ্বন্দ্ব, যা আমার মনে যথেষ্ট দুঃখ সঞ্চার করেছিল। খানে আজমের পুত্র মীর্জা নুরকে হত্যাপরোধে আমার সামনে হাযির করা হয়েছিল। যুবকটি আমার পিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন, তাকে আমার পিতা নিজ সন্তানের মতই ভালবাসতেন। যুবকটিও তাঁকে খুশী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। এই সব কারণে ফরিয়াদীদের সঙ্গে তাকে অবিলম্বে কাযী ও মীর আদেলের (বিচার মন্ত্রী) কাছে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাযী ও মীর আদেলকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, আইন অনুযায়ী যা সত্য হয় তা করার জন্য। যথাসময়ে বিচার বিভাগের দুজন কর্মচারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট আমার সামনে উপস্থাপিত করা হল। সেই রিপোর্টে বলা হয়, খানে আজমের পুত্র মীর্জা নুর ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ হত্যার অপরাধে দোষী বলে সাব্যস্ত এবং মুহাম্মদ (সা)-এর আইন অনুযায়ী 'রক্তের বদলা একমাত্র রক্তেই সম্ভব।' পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানের অন্যথা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হল। আমি হাজারও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম।^{১০}

৬. বোখারাবাসী সৈয়দ আবদুল ওহাবের পুত্র সৈয়দ কামালের হাতে আমার পিতা দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। ঐ কাজে তিনি বহু বছর নিযুক্ত ছিলেন।

৮. স্মার্ট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ৪৫-৪৬।

৯. ঐ, পৃ. ৪৭।

১০. ঐ, পৃ. ৫৪

ঐ দায়িত্বের পরিচালনায় দেখা গেল তিনি এমন সব কাজ করেছেন, যা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের সাথে মোটেই খাপ খায় না। তার দরুন তাঁকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে প্রথম আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কেননা ন্যায়নিষ্ঠাই হচ্ছে আমার স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পিতার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ কবে তাঁকে মার্জনা করতে বাধ্য হলাম। অন্য কোন শাস্তি না দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতা থেকে তাঁকে অপসারিত করে দিলাম।^{১১}

৭. রাভী নদীর বুকে বেশ কয়েকটি শূলদণ্ড প্রোথিত করবার হুকুম আমি দিয়েছিলাম ঝারোকায় বসে। আমার বিরুদ্ধে খসরুর সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিল, সেই সাতশো বিশ্বাসঘাতককে আমি জ্যাক্ত শূলে চড়িয়ে দিলাম। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না। তার কারণ, মৃত্যুর আগে তাদের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ঐ নির্যাতনের দৃশ্য তাদের জন্য উদাহরণস্বরূপ, যারা তাদের প্রতি-পালকদের বিরুদ্ধে কুচক্রে মেতে ওঠে।^{১২}

৮. উজ্জয়নীতে থাকাকালীন বীভৎস একটি রক্তাক্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরাধের ইতিহাসে তার নজীর মেলা ভার।

জনৈক মোগল বেশ কিছুদিন ধরে উজ্জয়নীতে এক বাজার এলাকায় বাস করত। সে মদ্যাসক্ত মেয়েদের আমন্ত্রণ জানাত, তাদেরকে কাছাকাছি এক বাগানবাড়িতে পাটি দিয়ে সে বলত, এমন জমকাল পাটি সে দেবে যা তাদের ধারণাভীত।

যেসব মহিলা আমন্ত্রিত হত তারা দামী গহনাপত্র পরে আসত পাটিতে। তাদেরকে ঐ শয়তান মদ খাইয়ে মাতাল করে খুন করে গহনা পত্র কেড়ে নিয়ে ফিরে আসত নিজের বাড়িতে। বেশ কয়েক সপ্তাহ এমন করে বেড়াল লোকটা। এমন হীন কাজ করে লোকটা জমিয়েছিল পয়তাল্লিশ হাজার তোমান (১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, এক তোমান সমান ৩৩ টাকা)।

অবশেষে ঐ ধরনের জনৈক মহিলাকে সে আমন্ত্রণ করেছিল। মহিলাও যথারীতি সবচেয়ে দামী অলঙ্কারপত্রে সেজেগুঁজে নির্দিষ্ট জায়গায় এসেছিল সঙ্গে একজন পরিচারিকা ও সহিস নিয়ে। নির্দিষ্ট জায়গায় মহিলা সেই মোগলকে দেখতে পেল তার জন্য অপেক্ষা করছে। পোড়াকপালি ঐ মহিলাকে সে মদ খাওয়ায়, পরিচারিকা ও সহিসকে সে হত্যা করে ফেলল, তারপর ধনুকের ছিলা মহিলার গলায় ফাঁসের মত জড়িয়ে তাকে হত্যা করে লোকটি তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করে রক্তরঞ্জিত গহনাপত্র নিয়ে ফিরে এল তার বাসভবনে।

তার এই দুর্বৃত্তপনা যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল। যে মহিলাকে সে হত্যা করেছে তার মৃতদেহ ও গহনাপত্রসহ পিশাচকে হাযির করা হল

১১. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ৫১।

১২. ঐ. পৃ. ১৪৭-১৪৮।

আমার কাছে। আমি কোতোয়ালকে নির্দেশ দিলাম খুনীর বাড়ি-ঘর তালাশ করার জন্য এই ভেবে যে, তার হাতে মৃত আরও অনেকের গহনাপত্রের খোঁজ হয়তো পাওয়া যাবে। যা ভেবেছিলাম তাই হল। তারা সেখান থেকে নিয়ে এল দুটি সিন্দুক। আমার সামনে সিন্দুক দুটি খোলা হলে পর দেখা গেল, মহিলাদের কমপক্ষে সাতশ জোড়া সোনার গহনাপত্র আছে, ঐ পোড়াকপালিদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া, যারা তার ঘৃণ্য লোভের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছে। যেইমাত্র এই ঘটনা সবাই জানল, মৃতদের আত্মীয়-স্বজন গয়না-গাটির দাবি জানাল; তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল সে সব। আমি নির্দেশ দিলাম এমন জঘন্য দুর্বৃত্তপনার নায়ককে প্রকাশ্যে, ভবিষ্যতের ভীষণ উদাহরণ হিসেবে, গরম লৌহশলাকায় বিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য।^{১০}

অন্যান্য সূত্র থেকেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিচার ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। উদাহরণ হিসেবে টেরির (Terry) কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি সম্রাটকে নিষ্ঠুরতা ও কোমলতার দিক থেকে 'চরম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষকে হত্যা করতে দেখে এবং হাতীর পায়ের তলায় মানুষকে পিষ্ট হতে দেখে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হতেন। তিনি সিংহকে পোষ মানাতেন এবং পোষমানা সিংহের সাথে যুদ্ধ করার জন্য লোককে আদেশ দিতেন। এভাবে অনেকে তাদের জীবন হারিয়েছে।^{১১} তিনি মদ খেতেন অত্যধিক অথচ মদ খাওয়ার জন্য অন্যকে কঠোর শাস্তি দিতেন। পরে অবশ্য তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।^{১২}

টেরি লিখেছেন, সম্রাট অতি তাড়াতাড়ি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকরী হত এবং অপরাধীদের সাধারণত প্রকাশ্য স্থানে শাস্তি দেওয়া হত। তিনি আরও লিখেছেন, "তাদের মধ্যে কোন আইন লিখিত আছে বলে আমি কখনও শুনিনি। সম্রাট ও তার প্রতিভূর ইচ্ছাই ছিল আইন। শহর ও প্রদেশের গভর্নরগণ একই পন্থায় বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন।" লিখিত আইনের অনুপস্থিতির ব্যাপারে স্যার থমাস রো টেরিকে সমর্থন করেছেন।^{১৩}

জাহাঙ্গীরের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে De Laet-এর মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তিনি বিচারালয়ে বসতেন এবং তাঁর সম্মুখে আনীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ তিনি ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে রায় প্রদান করতেন। তাঁর রায়ই ছিল চরম। রাজদ্রোহের অপরাধের শাস্তি সাধারণত

১৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, পৃ. ১১০-১১৯।

১৪. Hawkins in Purcha's Pilgrims, vol. III. p. 38, 41; quoted from Muhammad Akbar's Administration of Justice by the Mughals, p. 28.

১৫. Early Travellers in India by Foster, Quoted from Ibid.

১৬. Embassy of Sir Thomas Roe, Quoted from Ibid.

তঁার চোখের সম্মুখে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দেয়া হত। রাজধানী শহরে অথবা তিনি যেখানে বিচার কার্য সমাধা করতেন, সেখানেই এই শাস্তি দেয়া হত। অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি দেয়া হত। অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী অপরাধীদেরকে মস্তক ছিন্ন, অঙ্গহানি অথবা হাতি বা অন্য বন্য পশুর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হত।”^{১৭}

সাধারণ মামলার বিচার প্রতিদিনই সম্রাট উন্মুক্ত আদালতে বসে সম্পন্ন করতেন। যে সমস্ত মামলায় সাক্ষীর প্রয়োজন হত, সেই সব গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার তিনি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবারে সম্পন্ন করতেন। Hawkins উল্লেখ করেছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিদিন দু’ঘণ্টা করে উন্মুক্ত আদালতে সমস্ত মামলার বিচার করতেন। বিজয়াভিযান, প্রমোদ ভ্রমণ এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি এই নিয়ম পালন করতেন। দু’ কি তিন ঘণ্টা যাবত তিনি ঝরোকায় (Jhoroka) বসে অত্যাচারিত ব্যক্তিদের অভিযোগ শুনতেন এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতেন।”^{১৮}

প্রজারা অতি সহজেই সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। রাজকীয় বাগানের জনৈক মালী একবার সম্রাটের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, জনৈক গভর্নরের কর্মচারী তার অনুমতি ছাড়াই কয়েকটা গাছের চারা নিয়ে গেছে। তদন্ত করে মালীর বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হলে অপরাধীর দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলার আদেশ দেয়া হয়।”^{১৯}

সম্রাট জানতে পারেন যে, তাঁর সভাসদ খান আলমের ভাই-বোন হোসায়ন জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তদন্ত করে তার অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন।”^{২০}

বন্দীদের সম্পর্কেও সম্রাট খোঁজখবর রাখতেন। তিনি রনথম্বর দুর্গের সকল বন্দীর অপরাধ তদন্ত করে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশ দেন। এমনকি সভাসদগণও তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি। সৈয়দ খান চাগতাই-এর নপুংসকরা গরীবদের ওপর অত্যাচার করলে সম্রাট তাকে এই মর্মে এক নির্দেশ দেন যে, ছোট-বড় কোন অত্যাচারই তিনি সহ্য করবেন না। এই ধরনের অপরাধ পুনরায় সংঘটিত হলে তাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও তিনি নির্দেশ দেন।”^{২১}

সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত প্রাদেশিক গভর্নরগণ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন না। Thevenot লিখেছেন “এই ক্ষমতা একান্তভাবে সম্রাটের নিজের। কাউকে মৃত্যুদণ্ড

১৭. The Empire of the Great Mughal by De Laet, translated by J. S. Hoyland and S. N. Bannerji, Quoted from *ibid*.

১৮. Hawkins in Purcha's Pilgrims, vol. III, p. 46, Quoted from *ibid*.

১৯. Memoirs, translated by Rogers and Beveridge, vol. II, p. 14, Quoted from *ibid*.

২০. Memoirs, p. 211

২১. *Ibid*, vol. I, p. 13

দেওয়ার প্রয়োজন হলে একজন দূতকে সম্রাটের নিকট তাঁর অনুমতি চেয়ে পাঠান হত এবং দূত ফিরে না আসা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান স্থগিত রাখা হত।^{২২} অপরাধীকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হত। টেরী উল্লেখ করেছেন যে, এজন্য কুকুর ও সাপকেও ব্যবহার করা হত।^{২৩}

Manucci বলেছেন, যদি তাঁর কর্মচারীরা বিচারকার্য সমাধার ব্যাপারে কোন অন্যায় করত তাহলে তিনি তাদেরকে দরবার হলে রক্ষিত সিংহের দিকে নিক্ষেপ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটা চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, এগুলো নিম্নরূপঃ^{২৪}

১. একবার নদীর মধ্যে একটা কলসী পাওয়া গেল। কলসীর মধ্যে একটা মৃতদেহ ছিল-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। বিচার বিভাগের অফিসারগণকে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হলো। অবশেষে উক্ত কলসীর প্রস্তুতকারীকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারই সাহায্যে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হয়।

২. একবার এক মহিলা জনৈক রাজপুতকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তদন্ত পরিচালনার পর সম্রাট জানতে পারেন যে, মহিলার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য মহিলাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয় এবং অবহেলার জন্য আইন অফিসারকেও জরিমানা করা হয়।

বন্দীদের নাক ও কান কাটার ব্যাপারে জাহাঙ্গীর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বহুদিন থেকে আটককৃত বন্দীদেরও তিনি মুক্ত করে দেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সকল আমীরকে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যেন কোন ব্যক্তিকেই অন্ধ না করা হয়। তাছাড়া মুসলমানদের দায়িত্বের বোঝা অপর কারও ওপর না চাপানোরও তিনি নির্দেশ দেন। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক নির্দেশ জারি করেন যে, মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দণ্ড প্রদান সূর্য ডোবার পূর্বে দেওয়া উচিত নয় এবং সে সময় পর্যন্ত দণ্ড দান স্থগিত রাখার কোন নির্দেশ যদি জারি করা না হয় তবে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকরী করা যাবে। একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যাবার পর এই নির্দেশ জারি করা হয়। ঘটনাটি নিম্নরূপ : সম্রাট একজন বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। তাঁর আদেশ যথারীতি কার্যকরী করা হয়। কিন্তু কিছু সময় পর সভাসদগণের সুপারিশ-ক্রমে সম্রাট উক্ত বন্দীর মৃত্যু দণ্ডদেশ প্রত্যাহার করেন। এই প্রত্যাহার আদেশ পৌঁছার পূর্বেই লোকটাকে হত্যা করা হয়। তখন থেকেই সম্রাট উপরোক্ত আদেশ জারি করেন।

২২. Travels in the Levant by Thevenot, vol. III, p. 19, Quoted from ibid.

২৩. Early Travellers in India by Foster, p. 326, Quoted from Ibid.

২৪. Storia Do Mogor by Manucci, Quoted from Ibid.

‘ন্যায় শৃঙ্খল’ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাহাঙ্গীর ন্যায়বিচারের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই ন্যায় শৃঙ্খল স্থাপনের মধ্যেই ন্যায়বিচারের প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, কেউ সাহস করে ন্যায় শৃঙ্খল ব্যবহার করেছে কিনা তার কোন নজীর নেই। কিন্তু সাক্ষ্যের অভাবে আমাদের ধরে নিতে বাধা নেই যে, এটা যথারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। হতে পারে, এটা এমনই একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, তা উল্লেখ করা কেউ প্রয়োজন মনে করেনি।

পরিশেষে জাহাঙ্গীর সম্পর্কে রজার্সের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। ‘জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী’ শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

“হালামের মন্তব্য অনুযায়ী একজন মুসলমান বাদশাহের প্রধান গুণ হল অন্যায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করা। অন্যান্য দিকে যথেষ্ট দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের অবদান অতুলনীয়। ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের জন্য বর্তমান কালেও তিনি মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র।’

সম্রাট শাহজাহান

শাহজাহান ছিলেন দিল্লীর পঞ্চম মোগল সম্রাট। পিতার নাম সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং মাতার নাম যোধাবাই। তাঁর আদি নাম খুররম। উদয়পুরের রাজাকে পরাজিত করার পর পিতার কাছ থেকে ‘শাহজাহান’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় মনোভাব পোষণ করলেও পরে তিনি অত্যন্ত ধীর প্রকৃতি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনানুরাগী। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, মরকত প্রভৃতি মণি ও হীরকাদিতে খচিত ‘ময়ূর সিংহাসন’ নির্মাণ করতে তিনি ছকোটেরও বেশী টাকা ব্যয় করেন। স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি তাঁর সমাধির উপর বিখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেন। আত্মার মতি মসজিদ, দিল্লীর জুমা মসজিদ তাঁর অমর কীর্তি। এছাড়া তিনি দিওয়ান-ই-খাস-এর মত বহু মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। স্বীয় পুত্র আওরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত করে এবং পিতাকে প্রাসাদ মধ্যে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করেন। এভাবে আট বছর যাবত আত্মার দুর্গে দুঃখময় বন্দী জীবন যাপন করার পর ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্রাট শাহজাহান প্রায়ই বলতেন, ন্যায়বিচার তাঁর সরকারের মূল ভিত্তি। তাঁর রাজত্বকাল শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। বিচার বিভাগের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। কিন্তু অত্যাচারীর প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর। কোন প্রজার উপর সরকারী কর্মচারীর অত্যাচার তিনি মোটেই বরদাশ্ত করতে পারতেন না। এসব ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। দরবারে তিনি বুড়িভর্তি বিষধর সাপ রাখতেন এবং অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী কর্মচারীকে তিনি উক্ত সাপ দ্বারা দংশনের ব্যবস্থা করাতেন। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করত ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্রাটের সম্মুখ থেকে সরান হত না।^১ এই কঠোর শাস্তির কথা মনে করে সরকারী কর্মচারীরা

১. Storia Do Mogor, vol. I, p. 197, Quoted from The Administration of Justice by Mughals by Muhammad Akbar, p. 35.

প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করতে সাহস পেত না। ফলে প্রজারাও রাজকর্মচারীর উৎপীড়ন থেকে মুক্ত ছিল।

সম্রাট শাহজাহান প্রতিদিনই কিছু সময় বিচার বিভাগীয় কাজে ব্যয় করতেন। সকালে তিনি যখন ‘ঝরোকা দর্শনে’ যেতেন, তখন তিনি প্রায়ই একটা দড়ি জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। অপেক্ষমান জনগণ তাদের আবেদন পত্র উক্ত দড়ির সাথে বেঁধে দিত। সম্রাটের কর্মচারীরা আবেদন পত্রগুলো তৎক্ষণাৎ সম্রাটের সম্মুখে পেশ করত। এভাবে সাধারণ লোক সরাসরি সম্রাটের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করতে পারত।

বাদশাহনামা’র লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী উল্লেখ করেছেন যে, শাহজাহান বুধবার দিন বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। ঐ দিন কোন সাধারণ আদালত বসত না। তিনি সকাল বেলায় বিচারাসনে বসতেন এবং মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। দিল্লী দুর্গের দিওয়ান-ই-খাস-এর দেয়ালে ‘মিজান-ই-আদালত’ বা ‘ন্যায় বিচারের দাড়িপাল্লা’ অঙ্কিত ছিল। বিচারাসনে বসার পূর্বে সম্রাট এই ছবি দেখতেন, যেন তিনি তাঁর বিচারে নিরপেক্ষ রায় দিতে পারেন। ন্যায়বিচারের এই পাল্লা তাঁকে উৎসাহিত করত এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেন। বিচারের দিন মুফতি, কাযী, উলামা এবং সভাসদগণও উপস্থিত থাকতেন। উলামাদের সাথে আলোচনা করে এবং নিজে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে তিনি রায় প্রদান করতেন। বহু লোক বহু দূর থেকে সম্রাটের কাছে বিচারার্থী হয়ে আসত। তাদের অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য গভর্নরগণের নিকট তাদের অভিযোগনামাগুলো পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে রায় প্রদান করার বা সম্রাটের নিকট তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হত।

আপীল করার ব্যাপারে সম্রাট পদ্ধতিগত ব্যবস্থা চালু করেন। গভর্নর বা কোন সুবার কাযীর আদালতে সর্বপ্রথম আপীল করা যেত। যদি কোন পক্ষ এঁদের বিচারে সন্তুষ্ট না হত তবে তারা প্রধান দেওয়ান বা আইন বিষয়ক প্রধান কাযীর নিকট আপীল করতে পারত।

সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে যেসব চমকপ্রদ মামলার বিচার করেন, তার বিবরণ দেয়া হল ৪^২

১. জনৈক সৈনিক জনৈক হিন্দু কেরানীর ক্রীতদাসীকে নিজ কন্যা বলে দাবি করে। মেয়েটিও সৈনিকের দাবি সমর্থন করে। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর সম্রাট মেয়েটিকে রাজপ্রাসাদে রেখে দেন। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দর কালি তৈরি করতে পারত।

মেয়েটির এই দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হয়ে সম্রাট তাকে কেরানীর কাছে প্রত্যর্পণ করেন। সৈনিককে নির্বাসন দেওয়া হয়।

২. চারজন ব্যবসায়ী তাদের দোকানে একটা বিড়াল রেখেছিল। তাদের মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, তারা প্রতিদিন একজন করে দোকানে আসবে এবং প্রদীপের জন্য তেল ও বিড়ালের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। ইঠাৎ একদিন বিড়ালটির একখানা পা ভেঙ্গে যায়। যে ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে বিড়ালটির পা ভেঙ্গে যায়, সে-ই বিড়ালটির চিকিৎসা করতে বাধ্য হয়। এমন অবস্থায় বিড়ালটির শরীরে একদিন আঙুন লাগে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য বিড়ালটি বস্তার নীচে গিয়ে লুকায়। ফলে সমস্ত দোকানই ভস্মীভূত হয়। অপর তিনজন ব্যবসায়ী বিড়ালের চিকিৎসা প্রদানকারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে। নিম্ন আদালত তিন জনের পক্ষেই রায় প্রদান করে। মামলাটি সম্রাটের গোচরীভূত করা হলে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত রায় প্রদান করে বলেন যে, বিড়ালের আরোগ্য লাভের জন্য যে ব্যবসায়ী দায়ী ছিল তাকেই অপর তিনজন ব্যবসায়ী ক্ষতি পূরণ করবে। কারণ ভাঙ্গা পায়ের ওপর ভর করে বিড়াল হাঁটতে পারে না। সুতরাং বিড়ালটির বাকি তিনখানা পা, যা অপর তিনজন ব্যবসায়ীর ভাগে আঙুনের জন্য দায়ী।

৩. চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে শাহজাহান অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। চোরকে ফাঁসি বা নির্বাসন দেওয়া হত। চোর পালিয়ে গেলে অফিসারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হত। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে পর্তুগীজ কারখানা লুণ্ঠিত হয়। পর্তুগীজরা ক্ষতিপূরণের আবেদন জানালে সুরাটের গভর্নর বিশেষ আমল দেন না। সম্রাট এ খবর জানতে পেয়ে সুরাটের গভর্নরকে তাঁর স্বীয় তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন।

Manucci বেশ কয়েকটা চমকপ্রদ মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট নিজেই এসব মামলার বিচার সমাধা করেন।^৩

১. গুজরাটের গভর্নর নাসির খান প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। এ খবর সম্রাটের কানে না দেওয়ার জন্য সে সংবাদ প্রেরককেও উৎকোচ প্রদান করে। উক্ত এলাকার ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। তারা কয়েকজন অভিনয়কারীকে উৎকোচ প্রদান করে কৌশলে ব্যাপারটি সম্রাটের গোচরীভূত করার চেষ্টা করে। অভিনয়কারীরা কৌশলে গুজরাটের বিশৃঙ্খলার কথা সম্রাটকে অবগত করাতে সমর্থ হয়। সম্রাট বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিষয়টি আদৌ সত্য কিনা সম্রাট তা জানতে চান। অভিনয়কারীদের মধ্যে যেসব ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী ছিল, তারা তাদের পরিচয় সম্রাটের নিকট পেশ করে গুজরাটের বিশৃঙ্খলার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তদন্ত করার পর দেখা গেল ব্যবসায়ীদের বক্তব্য সত্য।

সম্রাট তখন নাসির খানের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাকে রোতাসগড় দুর্গে প্রেরণ করেন।

২. ১৬৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান দু'জন প্রতারককে কঠোর শাস্তি দেন। জনৈক যুবক জনৈক মহিলার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, উক্ত মহিলা তার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় সে তার সমস্ত অর্থ তার জন্য ব্যয় করেছে। মহিলাটির সাথে তার গভীর সম্পর্কের উল্লেখ প্রসঙ্গে সে মহিলাটির দেহের কয়েকটি চিহ্নের কথা বর্ণনা করে। কিন্তু মহিলাটি যুবকটির সাথে তার বিয়ের অঙ্গীকারের কথা অস্বীকার করে। বিচারক যুবকের পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং উক্ত মহিলার জন্য যে পরিমাণ যুবকটি ব্যয় করেছে তা ফেরত দেয়ার জন্য মহিলাকে নির্দেশ দেন। এক মাস পর মহিলাটি উক্ত যুবককে বিচারকের নিকট হাযির করে তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করে। যুবকটি স্পষ্টভাবে বিচারকের সম্মুখে বলে যে, সে উক্ত মহিলাকে চেনেই না। মহিলাটি তখন বিচারককে তাঁর পূর্ব প্রদত্ত রায়ের উল্লেখ করে বলে যে, যেহেতু লোকটা তাকে চেনে না, সুতরাং তার সাথে উক্ত যুবকের বিয়ের অঙ্গীকারের প্রশ্নই ওঠে না। অবশেষে সম্রাটের নিকট মামলাটির বিচার হয়। যুবকটি কিভাবে মহিলার শরীরের চিহ্নের কথা জানতে পারে তা জানতে চাওয়া হলে সে জানায় যে, জনৈক বৃদ্ধা উক্ত মহিলার বাড়িতে চাকরাণী হিসাবে কাজ করত। তার কাছ থেকেই সে সবকিছু অবগত হয়েছিল। সম্রাট উক্ত যুবক ও বৃদ্ধাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে তীর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

৩. কাবুল রাজ্যে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানা যায়। দরিয়া খাতুন নামে জনৈক ধনী মহিলা উজবেক গোত্রের ব্যবসায়ীদের রিয়ে করার প্রলোভন দেখাত। আকৃষ্ট ব্যবসায়ীকে পাহাড়ের নিকটবর্তী এক স্থানে নিয়ে গিয়ে মহিলাটি তাকে অক্ষম করে ফেলে তার পরিচিত লোকদের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করত। এভাবে সে উনিশজন কথিত 'স্বামীকে' বিক্রি করে। অত্যন্ত জটিল বিধায় কাবুলের গভর্নর সম্রাটের নিকট মামলাটি প্রেরণ করেন। সম্রাট উক্ত মহিলাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর আদেশ দেন।

৪. সভাসদের জনৈক কর্মচারী সম্রাটের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করে যে তার প্রভু (Master) তাকে বহুদিন ধরে বেতন দেয়নি। সভাসদকে ডেকে পাঠান হল। কর্মচারীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে প্রভুকে ঘোড়ার পেছনে ছুঁতে হুকুম দেওয়া হল। ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে এভাবেই ছুটল। কর্মচারীর প্রতি ন্যায়বিচার না করার জন্য সম্রাট তাকে তিরস্কারও করেন।

৫. সাদত খান নামে জনৈক কর্মচারী সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আদেশ অমান্যের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়। কাউকে পান বিতরণ না করার জন্য সম্রাট তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু আদেশ অমান্য করে গোপনে সে পান বিতরণ করতে

থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে সম্রাট নিশ্চিত হয়ে তাঁর সম্মুখেই তাকে পিটিয়ে হত্যা করার আদেশ দেন।

বন্দীদের সম্পর্কে সম্রাট অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গোয়ালিয়র দুর্গের সমস্ত বন্দীর মামলা তদন্ত করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ কতিপয় বন্দী ছাড়া সকলকেই তিনি মুক্তি দেন। পাঁচ বছর পর তিনি উক্ত দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উক্ত দুর্গে তখনও এগার জন বন্দী ছিল। তিনি তাদেরকে মুক্তির আদেশ দেন।^৪

যে সমস্ত দুর্গের পাশ দিয়ে সম্রাট অতিক্রম করতেন, সেই সমস্ত দুর্গের বন্দীদের মামলা তদন্ত করার ব্যাপারটা সম্রাট আইনে পরিণত করেন। কারাপালদের এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের কর্তৃত্বে আবদ্ধ সমস্ত বন্দীর মামলার বিবরণ সম্রাটের নিকট পেশ করতে হবে।^৫

সম্রাটের আদরের মেয়ে বেগম সাহেব জুর থেকে সুস্থ হওয়ার পর সম্রাট এক ভোজনের আয়োজন করেন। এটা তাঁর রাজত্বকালের সপ্তদশ বছরের ঘটনা। এই উপলক্ষে তিনি দেনার দায়ে আবদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেন এবং রাজকীয় কোষাগার থেকে তাদের দেনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়।^৬

বস্তুত সম্রাট শাহজাহানের ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগ ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর আমলের সব লেখকই তাঁর ন্যায়বিচারের প্রশংসা করেছেন।

৪ . বাদশাহ-নামা, আব্দুল হামিদ লাহোরী; মুহাম্মদ আকবর রচিত The Administration of Justice by the Mughals পুস্তক থেকে উদ্ধৃত।

৫ . ঐ

৬ . ঐ

সম্রাট আওরঙ্গজেব

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। তাঁর পুরো নাম ছিল আবুল মুজাফ্ফর মুহম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ-ই-গাযী এবং মাতার নাম মমতাজ মহল। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত হন। পিতা শাহজাহানকে অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারারুদ্ধ করে 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করে তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব দারা ও মুরাদকে হত্যা করেন এবং কনিষ্ঠ ভাই গুজা আরাকানে পালিয়ে যান। তাঁর সেনাপতি মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার এবং শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ জয় করেন। সম্রাট স্বয়ং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন। প্রথম দিকে মারাঠাদের দমন করতে ব্যর্থ হলেও শেষের দিকে তিনি প্রায় সমগ্র মারাঠা রাজ্য অধিকার করে দক্ষিণে সমুদ্র থেকে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। ধর্মনিষ্ঠার জন্য আওরঙ্গজেব ইতিহাসে 'যিন্দাপীর' বলে খ্যাত। জনগণের নৈতিক অধঃপতন রোধের জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র নৃত্য-গীত, বেশ্যাবৃত্তি এবং মদ, গাজা, ভাজ সেরন নিষিদ্ধ করেন। মুসলমান সমাজে অমুসলিম রীতিনীতি দূর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে নিজের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ফতওয়া সংকলনে ব্রতী হন এবং তাঁর সংকলিত 'ফতওয়া-ই-আলমগীরী' আজও প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। তিনি টুপি সেলাই ও কুরআন নকল করে সেই অর্থে সরল জীবন-যাপন করতেন এবং পরম নিষ্ঠার সাথে নামায, রোযা ও আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট থাকতেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, আড়ম্বরহীন জীবন-যাত্রা, পূর্ণভাবে ন্যায্য শাসন পরিচালনার জন্য পরম উৎকণ্ঠা এবং ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁকে ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আহমদ নগরে পরলোকগমন করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব মনে করতেন 'প্রশাসনের উদ্যান ন্যায়বিচারের বারিধারায় সিঞ্চিত হয়।' তাঁর বিচার পদ্ধতি ছিল যত্ন, বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে, "তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি গরীবের উপর অত্যাচারকে উপেক্ষা করেন নি।" লেনপুল আরও লিখেছেন, "স্বয়ং সম্রাট, তাঁর মন্ত্রীবর্গ, তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং সকল অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা

নিম্নপদস্থ আবেদনকারীর জন্যও তাঁর আদালত ছিল উন্মুক্ত।” বোম্বাই ও সুরাটের ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আওরঙ্গজেব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের আধার। সাধারণভাবে তিনি যথাযথ ও নিরপেক্ষ বিচার করতেন....।”

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সম্রাট রাজপুত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।

একবার রাজপুত্র আজম তাঁর হারেমের তত্ত্বাবধায়ক নুরুলিসার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেন এবং রাজদরবারের কড়া শালীনতা ও শৃঙ্খলা উপেক্ষা করে তিনি আহমদাবাদের রাজকীয় উদ্যানে যাওয়ার সময় তাঁকে সাথে নিতে অস্বীকার করেন। নুরুলিসা বিষয়টি রাজপুত্রের নাজির ভিরোজের নিকট উত্থাপন করেন এবং রাজপুত্রের যাত্রা বন্ধ করার অনুরোধ জানান। ভিরোজ রাজপুত্রের যাত্রা বন্ধ করে দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করান। সম্রাট আদেশ দেন, “(উক্ত প্রদেশে) মনসবদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী সৈন্যসহ খাজা কুলি খান ও নারওয়ারের রাজা একযোগে রাজপুত্রের যাত্রা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করবে।” পরদিন রাজপুত্র এ খবর জানতে পেরে তাঁর বোন বাদশা বেগমের মাধ্যমে স্থায়ী অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে সম্রাটের নিকট আবেদন পেশ করেন এবং নাজির ও নুরুলিসার সীলমোহরাক্ষিত একটি আপোসমূলক চুক্তিও সম্রাটের নিকট পেশ করেন। সম্রাট রাজপুত্রের আবেদন পাঠ করে মন্তব্য করেন, “আমি তোমার মহল (জায়গীর) বাজেয়াপ্ত করা থেকে বিরত হলাম। কিন্তু তোমাকে কোন রকম আর্থিক শাস্তি প্রদান করা না হলে এই ধরনের কাজ করার সাহস তুমি আবার দেখাবে। অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নীচমনা এবং বোকা পুত্রের মাহিনা থেকে শাস্তিস্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা সরকারী কোষাগারে গ্রহণ করা উচিত।”

রাজপুত্র আজম যখন আহমদাবাদের গভর্নর ছিলেন, তখন সুরাটের পথে একদল বণিক আহমদাবাদ থেকে সত্তর মাইল দূরে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। বিষয়টি গভর্নরের অবগত করানো হলে তিনি মন্তব্য করেন যে, “ঘটনাটি সুরাটের খাজনা আদায়কারী আমানত খানের এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই।” এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্রাট অবগত হওয়ার পর তিনি তৎক্ষণাৎ আজমকে দায়িত্বহীনতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁর কাছ থেকে আদায় করে তিনি তার পদাবনত করেন। এই মর্মে সম্রাট যে আদেশ দেন তা নিম্নরূপ :

‘রাজপুত্রের স্থায়ী পদ থেকে পাঁচ হাজারী সম্মান কমিয়ে দাও এবং ব্যবসায়িগণ কর্তৃক কথিত লুণ্ঠিত সম্পদের মূল্য তাঁর এজেন্টদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যদি তিনি (আজম) রাজপুত্র না হয়ে অন্য কোন অফিসার হতেন তাহলে এই আদেশ

অনন্তর পর কার্যকরী করা হত। রাজপুত্রের ক্ষেত্রে এই শাস্তি হল তদন্ত না করার জন্য! ধিক তোমার রাজপুত্রত্ব! তুমি আমানত খানের চেয়ে নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করেছ। আমার জীবিতকালে আমানত খানকে কেন তুমি তোমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশীদার করছো না?”^১

শাহজাহানের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি মন্তব্য করেন, “আপনি স্মরণ করুন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতাগণ সর্বক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে পরিচিত নন। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ প্রায়ই অসভ্য বর্বর শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়েছে এবং বিজিত বিশাল এলাকা অল্প দিনের মধ্যেই ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। তিনিই সত্যিকারের সম্রাট, যিনি তাঁর প্রজাদের নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শাসন করাকে জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন।”^২

সম্রাট আওরঙ্গজেব মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। অত্যাচারিত জনগণ কোন বাধা ছাড়াই তাঁর কাছে সরাসরি অভিযোগ পেশ করতে পারতো। প্রসিদ্ধ আইন বিজ্ঞানীদের রচিত পুস্তক সম্রাট পাঠ করতেন। আইনের নীতি অনুধাবন করার জন্য তিনি ইমাম গাজ্জালী, শেখ শরাফ ইয়াহিয়া মুনিরি এবং অন্য আরও অনেকের পুস্তক এবং আইনের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করতেন এবং এ নীতি তিনি তাঁর সম্মুখে আনীত মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। প্রতিদিন দু’তিনবার তিনি জনসাধারণের অভিযোগ শুনতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী বারনিয়ার আওরঙ্গজেবের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন : ‘..... আম-খাস-এ আগত জনগণের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অভিযোগনামা একত্রিত করে সম্রাটের কাছে আনা হত এবং সম্রাটকে এক এক করে পড়ে শোনান হত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা হলে সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই বিচারের রায় দেওয়া হত। সপ্তাহের অপর একদিন নিম্ন আদালত থেকে পেশকৃত দশজন নির্বাচিত লোকের মামলা জনৈক ধনী, সম্ভ্রান্ত ও বৃদ্ধ লোক সম্রাটের কাছে পেশ করতেন এবং সম্রাট দু’ঘণ্টা ধরে তা শ্রবণ করতেন। অপর একদিন তিনি দু’জন প্রধান কাযীসহ আদালতখানা বা আদালত ভবনে বিচার কার্যে উপস্থিত থাকতেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এশিয়ার সম্রাটগণকে আমরা নিষ্ঠুর হিসেবে চিহ্নিত করলেও জনসাধারণের প্রাপ্য ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁরা অমনোযোগী ছিলেন না।’^৩

১. A. Aziz : Discovery of Pakistan.

২. Quoted from Ibid. p. 117.

৩. Bernier, p. 263, Quoted from Muhammad Akbar's The Administration of Justice by the Mughals.

সম্রাটের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে Manucci লিখেছেন : 'সম্রাট আম-খাস দরবারে বসে অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ শুনতেন। এদের মধ্যে কেউ হয়ত বিশৃঙ্খলা অবসানের দাবী জানাত। সম্রাট রেগে যেতেন। অল্প কথায় তিনি রায় দিতেন, যেমন--চোরের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়ার, "লুণ্ঠিত পথিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ফৌজদার ও গভর্নরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করতেন যে, আইন অমান্যকারীর জন্য কোন ক্ষমা নেই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতেন।"^৪

পিতার মত আওরঙ্গজেব প্রতিদিন নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করতেন। প্রাতঃ-কালের ইবাদত শেষে তিনি বিচার কার্যে মনোযোগ দিতেন। অভিযোগ আনয়নকারী ব্যক্তিদের তাঁর সামনে হাযির করা হত। দূর থেকে আগত লোকদের অভিযোগ তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনতেন এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শরীয়তে নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করতেন।^৫

পবিত্র কুরআনের বিধি অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পন্ন করতে আওরঙ্গজেব বিশেষ-ভাবে উদ্বিগ্ন থাকতেন।^৬ ফলে কাযীর প্রভাব ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। অধিকাংশ মামলাই কুরআনের বিধি মূতাবিক মীমাংসা করা হত এবং দেশীয় প্রথার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথাগত আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। এসব ক্ষেত্রে সম্রাট কোন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন না।

কোন বাঁদীর আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হলে সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হত। যোহর নামাযের পর সম্রাট তাঁর নিজস্ব কক্ষে অবস্থান করার সময়ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আবেদনপত্র গ্রহণ করতেন। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সভাসদগণের উপর ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের প্রভাব থাকা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ত। কারণ সভাসদগণকেই দারোগা-ই-আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আবেদনপত্র সম্রাটের নিকট পেশ করতে হত। এমনকি হারেমেও তিনি মহিলা, বিধবা এবং এতিমদের আবেদন গ্রহণ করে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন।^৭

৪. Storia, voll. 111, p. 462, Quoted from Ibid.

৫. Badshahnama, Quoted from Ibid.

৬. Mughal Administration. Jadunath Sarkar.

৭. আলমগীরনামা, পৃ. ১২০-৩, Quoted from The Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar.

সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটা দিন অর্থাৎ বুধবার তিনি কাষী, মুফতি, উলামা ও কোতওয়ালের উপস্থিতিতে দিওয়ানী-খাস-এ দুপুর পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বিচার করতেন।

সম্রাট রাজকীয় বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন। তিনি কোন সম্ভ্রান্ত সভাসদকেও ব্যক্তিগতভাবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা অনুমোদন করতেন না। ফিরোজ জঙ্গ জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ খবর জানতে পেরে সম্রাট ফিরোজ জঙ্গকে সতর্ক করার জন্য আসাদ খানকে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন--

“আপনি জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন প্রমাণ ছাড়াই আপনি তা ধ্বংস করেছেন। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা এসে রক্তের বদলে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে কি অবস্থা হবে! কিভাবে আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকব? দণ্ডবিধি কার্যকরী করার সময় দয়া প্রদর্শন করা কুরআন অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করার শামিল। ধর্মের ব্যাপারে দয়া যেন প্রভাবশালী হাতিয়ার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।”^৮

সম্রাটের কথায় “..... যিনি সমতার ভিত্তিতে তাঁর প্রজাগণকে শাসন করা জীবনের প্রধান কাজ বলে গ্রহণ করেন, তিনিই সত্যিকারের সম্রাট।”^৯

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেন তা অভিন্টনও স্বীকার করেছেন। কোন ব্যক্তি তার পদমর্যাদার জন্য সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। ধনী ও দরিদ্র সকলেই তাঁর দরবারে সমান বিচার পেতেন।^{১০}

ইতালীয় পরিব্রাজক কেরিরি (Careri) সম্রাটের গুণগান করেছেন। তাঁর মতে, সম্রাট কর্মচারী ও সভাসদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় আবেদনপত্র গ্রহণ করতেন। বিশেষ সতর্কতার সাথে তা সম্রাটকে পড়ে শোনান হত এবং তিনি তার উপর মন্তব্য করতেন।^{১১}

১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, গুজরাটের বিচারকগণ সপ্তাহে তিনদিন ছুটি ভোগ করে থাকেন এবং মহকুমা আদালতে সপ্তাহে মাত্র দুদিন উপবেশন করেন। সম্রাট তাঁদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং তাদেরকে

৮. Jadunath Sarkar, Mughal Administration.

৯. Quoted from the Administration of Justice by the Mughals by Muhammad Akbar.

১০. Voyage to Serat by Ovington, Quoted from Ibid.

১১. Voyage round the World by Gameli Careri, Quoted from ibid.

রাজকীয় আদালতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। তাঁদেরকে সপ্তাহে পাঁচ দিন আদালতে হাযির থাকতে বাধ্য করার জন্য দেওয়ান খাজা মুহাম্মদ হাসিমকে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি নির্দেশ দেন যে, বিচারকগণকে অবশ্যই সূর্য উঠার এক ঘণ্টা পর থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কাজ করতে হবে। একমাত্র যোহর নামাযের সময় তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে পারবেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক সম্পাদিত একটা চমকপ্রদ বিচারের ঘটনা জানা যায়। জনৈক লোক ভণ্ড ফকির সেজে তার মৃত ঘোড়াটি কবর দিয়ে কবরটি জনৈক দরবেশের বলে প্রচার করে। ভণ্ড ফকিরটি ছিল একজন সৈনিক। তার ঘোড়াটি মারা যায় এবং ঘোড়া কেনায় সমর্থ ছিল না। সে ফকিরের ন্যায় উক্ত কবরের পাশে ধ্যানমগ্ন থাকত। এতে তার বেশ দু'পয়সা আয় হত। আওরঙ্গজেব একদিন উক্ত কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ফকিরের কাছে জানতে চান উক্ত কবরটি কোন্ দরবেশের। ফকির উত্তর দিলে সম্রাটের সন্দেহ হয় এবং তিনি কবরটি খোঁড়ার আদেশ দেন। কবর খোঁড়ার পর ঘোড়ার হাড় পাওয়া যায়। শাস্তিস্বরূপ উক্ত ভণ্ড ফকিরকে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন দেওয়া হয়।

১৭০২ সালে সম্রাট দিওয়ান-ই-আদালতের নাম পরিবর্তন করে দিওয়ান-ই-মুজলিম রাখেন।

মোগলদের দণ্ডবিধি

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে কোন লিখিত আইন ছিল না। সম্রাটের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত। প্রশাসনের সব শাখার ওপরই তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। সুষ্ঠুভাবে বিচার ব্যবস্থা চলার জন্য ইসলামী আইন এবং অধ্যাদেশ জারী করার পূর্ণ ক্ষমতা সম্রাটের ছিল। লিখিত আইনের অবর্তমানে যে সব অসুবিধা দেখা দেয়, সম্রাট আওরঙ্গজেব তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। তিনি ইসলামী নীতিসমূহের ওপর নির্ভর করে সরকার পরিচালনা করার প্রয়াস পান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ আইন রাজ্যের সর্বত্রই কার্যকর করা। তিনি যোগ্য, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করেন এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত শেখ নিজামকে ‘ফতওয়া-ই-আলমগীর’ রচনা করার ভার অর্পণ করেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে এই পুস্তকখানা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

মোগল যুগের প্রথম দিকে বিচার ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। সম্রাট বাবর এত অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করেন যে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ তাঁর হয়নি। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে চিন্তা করার সৌভাগ্য সম্রাট হুমায়ুনেরও হয়নি। সম্রাট আকবর অবশ্য বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। বিচার ব্যবস্থা সুচারুভাবে চলার জন্য সুবাদারদের প্রতি মাঝে মাঝে তিনি ফরমান জারী করতেন। একমাত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরই তাঁর অফিসারদের পরিচালিত করার জন্য লিখিত আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ব্যাপারে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সত্যিই বিস্ময়কর। সংক্ষেপে এগুলোর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

১. তমখা ও মীর বাহারি’র নামে কর সংগ্রহ এবং প্রত্যেক সুবা ও সরকারের জায়গীরদারগণ তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য অন্যান্য যে সব কর আদায় করতেন, তিনি তা বন্ধ করে দেন।
২. যে সব রাস্তায় ডাকাতরা নির্বিঘ্নে ডাকাতি করত, সেই সমস্ত রাস্তায় সরাইখানা, মসজিদ নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় জায়গীরদারদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।
৩. কোন ব্যবসায়ীর সম্মতি ছাড়া রাস্তায় তার মালপত্র খোলা যাবে না। কোন উত্তরাধিকার না থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের আওতায় চলে যাবে এবং সেই সম্পত্তির অর্থ দিয়ে মসজিদ, সরাইখানা নির্মাণ, পুল মেরামত এবং পুকুর ও কুয়া খনন করা হবে।

৪. মদ ও অন্যান্য যাবতীয় মাদক দ্রব্য তৈরী করা বা বিক্রি করা নিষেধ করে দেওয়া হয়।
৫. কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির গৃহে বসবাস করতে পারবে না। কোন অপরাধীর নাক বা কান কাটা যাবে না।
৬. খাস জমির অফিসার এবং জায়গীরদারগণ প্রজার জমি জোরপূর্বক দখল করতে পারবে না বা উক্ত জমি নিজের জন্য চাষাবাদ করতে পারবে না। খাস জমির খাজনা আদায়কারিগণ অনুমতি ছাড়া তাদের জেলার অধিবাসীদের সাথে কুটুম্বিতা স্থাপন করতে পারবে না।
৭. বৃহস্পতিবার, রবিবার এবং বছরের অন্যান্য নির্দিষ্ট দিনে তিনি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন।

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব গুজরাটের গভর্নরের নিকট যে ফরমান প্রেরণ করেন তা আওরঙ্গজেবের দণ্ডবিধি হিসেবে পরিচিত। কোন বৈধ কারণ ছাড়া গ্রেফতার না করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো মেনে চলার নির্দেশ দেন :

১. কোন কাযীর সামনে বৈধ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলে বা অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করলে কাযী তার উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদান করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জেলে আটক রাখতে হবে।

২. শহরে চুরির হার বৃদ্ধি পেলে এবং কোন চোরকে ধরা হলে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তার শিরশ্ছেদ করবে না বা তাকে শুলে চড়াবে না। কারণ এটাই তার প্রথম অপরাধ হতে পারে।

৩. বৈধভাবে শাস্তিযোগ্য নয়, এমন পরিমাণ অর্থ কেউ একবার চুরি করলে তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দেবে। কিন্তু সে যদি পুনরায় একই অপরাধ করে তবে তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্দীশালায় আটকে রাখবে। যদি সে সংশোধনার্থে শাস্তি ও আটকের পরও চুরি করে তবে তাকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীত্বের আদেশ দিয়ে তা কার্যকরী কর এবং চোরাই দ্রব্য প্রমাণসহ প্রকৃত মালিককে, যদি তিনি উপস্থিত থাকেন, ফেরত দাও। অন্যথায় বায়তুলমালে তা জমা দাও।

৪. যদি কোন লোক দু'বার চুরি করে এবং দু'বারই সে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়ে থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি পুনরায় চুরি করে এবং তা প্রমাণিত হয় এবং এই ধরনের অপরাধ তৎকর্তৃক প্রায়ই সংঘটিত হতে থাকলে তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখ। এতেও যদি সে সংশোধন না হয় এবং পুনরায় একই অপরাধ করে, তবে তার জেলের মেয়াদ বাড়িয়ে দাও।

৫. কোন ব্যক্তিকে কবর খুঁড়ে শব বের করার অপরাধে গ্রেফতার করা হলে তাকে কঠোর তিরস্কার করে ছেড়ে দাও। কিন্তু যদি সে এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তবে তাকে নির্বাসন দাও অথবা তার দু'হাত কেটে দাও।

৬. কোন ব্যক্তি রাজপথে ডাকাতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলে বা সে তার অপরাধ স্বীকার করলে তাকে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাযীই এই শাস্তি প্রদান করবেন। কিন্তু তার অপরাধ যদি মৃত্যু বা অন্য কোন শাস্তির উপযুক্ত না হয় অথচ উক্ত সুবার গভর্নর এবং আদালতের অফিসারগণ শাস্তি প্রদানের পক্ষে রায় দেন, তবে তাকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীত্বের আদেশ দাও।

৭. লুণ্ঠিত দ্রব্য অন্য কারও কাছে গচ্ছিত রেখেছে বলে, গ্রেফতারকৃত চোর যদি স্বীকার করে এবং তৎকর্তৃক কথিত ব্যক্তির নিকট থেকে লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করা হলে এবং তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তি যদি চোরের সহযোগী বলে প্রতীয়মান হয় এবং সহযোগীর এই অপরাধ যদি প্রথমবারের মত হয় তবে সংশোধনার্থে শাস্তি প্রদান করবে। কিন্তু এটা যদি তার অভ্যাস হয় তবে সংশোধনার্থে শাস্তি দেওয়ার পর সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখবে। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি সে সংশোধিত না হয় এবং পুনরায় একই ধরনের অপরাধ করে তাহলে তাকে স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখ। লুণ্ঠিত দ্রব্যের নিরপরাধ ক্রেতাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না তবে তিন নম্বর বিধি অনুযায়ী লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করতে হবে। প্রমাণ সাপেক্ষে তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে, অন্যথায় তা বায়তুলমাল-এ জমা দিতে হবে।

৮. যে ব্যক্তি অন্যের ঘরে ডাকাতি করে ও তাদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে --এরূপ স্বভাবজাত অপরাধীর শাস্তি দীর্ঘমেয়াদী বন্দীত্ব।

৯. স্বভাবজাত অপহারক ও উচ্ছেদকারী জমিদারের মৃত্যু যদি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কাম্য হয় তবে তাদেরকে প্রমাণ সাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীত্বের ব্যবস্থা কর।

১০. শুধুমাত্র সন্দেহবশত কোন ব্যক্তিকে ঠগ, দস্যু বলে আটক করা হলে বৈধ প্রমাণ ছাড়াই তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি এবং অনুতাপ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখতে হবে। কিন্তু সে যদি অভ্যাসগতভাবে এ কাজ করে এবং বৈধভাবে তা যদি প্রমাণিত হয় অথবা উক্ত এলাকার জনগণ ও গভর্নর যদি তার দুর্কর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকে অথবা তার সম্পর্কে এরূপ দুর্কর্মের কোন ঘটনা জানা যায় বা কোন নিহত ব্যক্তির কোন মাল তার কাছে পাওয়া যায় এবং আদালতের সুবাদার ও অফিসারগণের বক্তব্য যদি তার সম্পর্কে এরূপ দুর্কর্ম করার দৃঢ় সম্ভাব্যতা প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা কর।

১১. চুরি, রাজপথে ডাকাতি, ঠগ দস্যু বা অসৎ উদ্দেশ্যে জনগণকে হত্যা করার সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে এবং এ ধরনের অপরাধ তৎকর্তৃক প্রায়ই

সংঘটিত হয় বলে আদালতের অফিসার ও সুবাদারগণ বক্তব্য পেশ করলে তাকে বন্দী করে রাখ, যেন সে অনুতপ্ত হয়। কেউ যদি উপরোক্ত কোন একটা অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কবে, তাহলে বিচারের জন্য কাযীর সাহায্য গ্রহণ কর।

১২. অন্যের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লোক জড়ো করে সুবিধামত সম্পদ লুণ্ঠকারীদের বা কাউকে অচেতন করে তার দ্রব্যাদি লুণ্ঠ করার জন্য ধুতরা, ভাং, ফুটিলা গাছের ফল বা অন্য কোন প্রকার চেতনা-নাশক দ্রব্যাদি প্রয়োগকারীদের প্রমাণসাপেক্ষে সংশোধনার্থে নির্ভুর শাস্তি দিয়ে আটক করে রাখ যেন তারা অনুতপ্ত হয়। মুক্তি লাভ করার পর তারা যদি পুনরায় একই অপরাধ করে তবে তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দী করে রাখ। এরূপ লোকের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত কোন মাল কেউ নিজের বলে দাবি করলে, তা কাযীর নিকট হস্তান্তর করবে। তিনিই প্রকৃত প্রমাণ সাপেক্ষে তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দেবেন এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধীর সম্পত্তি থেকে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ করবেন।

১৩. যদি কোন জনগোষ্ঠী বিদ্রোহ কবে, যুদ্ধের অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে—তারা বাধা প্রদান করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলেও তাদেরকে শ্রেফতার করে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখ। যদি তারা যুদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জন করে তাহলে তাদের আক্রমণ করে বিনাশ করে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছত্রভঙ্গ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পরাজিত এবং আহতদের হত্যা কর। কিন্তু ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর তাদেরকে আক্রমণ বা হত্যা করবে না। তাদের মধ্যে কাউকে শ্রেফতার করা গেলে তাদের দলের সংগঠন ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখ বা হত্যা কর। দলের কোন সম্পত্তি অধিকার করা হলে তাদের অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তা প্রত্যর্পণ করবে।

১৪. মুদ্রা জালকারীকে প্রথমবারের জন্য সংশোধনার্থে শাস্তি ও তিরস্কার করে ছেড়ে দাও। কিন্তু এটাই যদি তার পেশা হয় তবে তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখ। এই অভ্যাস যদি সে পরিত্যাগ না করে তবে দীর্ঘদিনের জন্য আটকে রাখ।

১৫. যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রা জালকারীর নিকট থেকে জাল মুদ্রা ক্রয় করে তা বৈধ মুদ্রা বলে দাবী করে তাহলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দী করা ব্যতীত ১৪ নম্বর বিধিতে উল্লেখিত শাস্তির অনুরূপ শাস্তি দিতে হবে।

১৬. জাল মুদ্রার নিরপরাধ মালিককে শাস্তি দেওয়া যাবে তবে মুদ্রাগুলো বিনষ্ট করে দিতে হবে।

১৭. যদি কোন লোক নিজেকে একজন অপরসায়নবিদ বলে দাবি করে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি প্রদান

করা ও বন্দী করে রাখ। তিন নম্বর বিধিতে উল্লিখিত শাস্তির অনুরূপ তাকে শাস্তি দিতে হবে।

১৮. কোন লোক প্রতারণা করে অপরের স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে নিয়ে গেলে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হলে স্বামীর নিকট স্ত্রীকে বা পিতার নিকট সন্তানকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখ। কিন্তু (ইত্যবসরে) যদি স্ত্রী বা সন্তান মারা যায়, তবে অপরাধীকে সংশোধনার্থে মারাত্মক শাস্তি প্রদান করে মুক্তি দাও অথবা সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে তাকে নির্বাসন দাও।

১৯. কোন লোক প্রতারণামূলকভাবে অন্যের উপর বিষ প্রয়োগ করলে (যার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক) তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখবে।

২০. জুয়া খেলার শাস্তি সংশোধনার্থে শাস্তি ও কারাবাস। পুনরায় একই ধরনের অপরাধ করলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস দিতে হবে। জুয়া খেলার সময় উদ্ধারকৃত মালামাল প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে অথবা ট্রাস্টে গচ্ছিত রাখতে হবে।

২১. ইসলাম ধর্ম অধ্যুষিত কোন এলাকার শহর অথবা গ্রামে মদ বিক্রির শাস্তি হল অপরাধীকে সংশোধনার্থে মারাত্মক আঘাত করা। পুনরায় একই অপরাধ করলে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস দিতে হবে।

২২. কোন লোক কোন চোলাইকারীকে (Distiller) চাকুরী দিয়ে চোলাই করা মদ বিক্রি করলে তাকে আঘাত করা সহ কারাবাস দাও। কিন্তু সম্রাটের নিকট তার প্রবেশাধিকার থাকলে বিষয়টি সম্রাটের গোচরীভূত করে চোলাইকারীকে প্রচণ্ড আঘাত ও তিরস্কার করবে।

২৩. ভাং, বাজা (Buza) এবং অনুরূপ মাদক দ্রব্য বিক্রেতাদেরকে সংশোধনার্থে শাস্তি দেয়া উচিত। কিন্তু অভ্যাসগত অপরাধীদেরকে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখবে।

২৪. কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়ে, কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে অথবা পাহাড়ের ওপর বা ছাদের ওপর থেকে জোরপূর্বক নিক্ষেপ করে যদি মেরে ফেলে তবে তাকে সংশোধনার্থে শাস্তি দেবে এবং বন্দী করে রাখবে। দেশীয় আইন মুতাবিক 'দিয়া' বা অপরাধ ফালন করে তার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে প্রদান করবে।

২৫. ব্যভিচারী কোন ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে এবং তার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

২৬. গভর্নরের সম্মুখে কোন লোক যদি মিথ্যাভাবে অন্য কাউকে দোষী বলে অভিযুক্ত করে এবং তার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে তবে সংশোধনার্থে শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা। এটা তার পেশা হলে দীর্ঘ মেয়াদের কারারুদ্ধ করা। যাদের সম্পত্তির সে ক্ষতি সাধন করেছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২৭. কোন 'জিম্মি' (পুরুষ অথবা মহিলা) কোন মুসলমানকে (পুরুষ অথবা মহিলা) তার ভৃত্য হিসেবে গ্রহণ করলে অথবা একজন জিম্মি, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া কোন মুসলমান পুরুষ বা মহিলাকে গ্রহণ করলে তাকে কাযীর সম্মুখে দেশীয় আইন অনুযায়ী বিচার করার জন্য পেশ করবে।

২৮. বেশ্যা, ব্যভিচারী, পায়ুকামী, মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনকারী; স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিসর্জনে প্রলুব্ধকারী, স্বধর্মত্যাগী, কাযীর আদেশের বিরোধিতাকারী এবং মহাজনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে পলাতক চাকরাণী বা চাকর পবিত্র আইনের নামে দিওয়ান অফিসারদের নিকট বিচারপ্রার্থী হলে কাযীর আদেশ মুতাবিক তোমাকে কাজ করতে হবে।

২৯. পবিত্র আইন মুতাবিক কোন লোকের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হলে অথবা প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলে অপরাধীকে বন্দী করে ঘটনাটি সম্পর্কে সম্রাটের নিকট রিপোর্ট করবে।

৩০. কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে খোজা করে দিলে তাকে কঠোর শাস্তি দিবে এবং অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

৩১. প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী নেতা নতুন ধর্মীয় প্রথা (বিদ'আত) প্রবর্তন করার জন্য অপরকে প্ররোচিত করলে এবং তার প্রবর্তিত বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে তাকে দীর্ঘ মেয়াদে আটকে রাখবে।

৩২. সুবাদারের নিকট ফৌজদার বা অন্য লোক কর্তৃক প্রেরিত বন্দীদের ক্ষেত্রে আগমনের অব্যবহিত পরেই তাদের ব্যাপারটি অধ্যবসায়ের সাথে পরীক্ষা করবে এবং ঘটনাটি রাজার ভূমির খাজনা সম্পর্কিত হলে দ্রুততার সাথে ঘটনাটির নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে তাদেরকে রাজস্ব অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে অথবা তাদের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত উপরে উল্লেখিত যেকোন ধারা অনুযায়ী বিচার করবে। পুলিশের হেফাজতে এবং কাছারীতে আটককৃত বন্দীদের ব্যাপার নিয়ে প্রতি মাসে একবার অনুসন্ধান চালাবে, —(নির্দোষীদের মুক্তি দেবে এবং অন্যদের দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার অনুরোধ জানাবে)। কোতওয়ালের লোক, রাজস্ব আদায়কারী বা কোন অভিযোগকারী কোন অভিযুক্ত লোককে গ্রেফতার করে কোতওয়ালের নিকট হাযির করলে কোতওয়ালের উচিত ব্যক্তিগতভাবে সেই ঘটনা তদন্ত করা। যদি সে নির্দোষ

হয় তবে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবে। তার বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ থাকলে তাকে আদালতের আশ্রয় নিতে বলবে। তার সঙ্গে রাজার ভূমির রাজস্ব বিভাগের কোন মামলা থাকলে তা সুবাদারকে জানাবে এবং সুবাদার কর্তৃক নির্দেশিত সনদ মুতাবিক কাজ করবে। কাযী যদি কোন লোককে আটকে রাখবার জন্য প্রেরণ করে তবে তোমার কর্তৃত্বের জন্য কাযীর স্বাক্ষরিত নির্দেশ গ্রহণ করে লোকটাকে আটকে রাখবে। লোকটার বিচারের জন্য কাযী কোন একটা দিন নির্দিষ্ট করলে, সেই নির্দিষ্ট দিনে বন্দীকে আদালতে প্রেরণ করবে ; অন্যথায় এই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিন তাকে আদালতে প্রেরণ করবে।

শাস্তির ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা

শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মোগল সম্রাটগণ ইসলামী আইন অনুসরণ করতেন। ইসলামী আইনের উপর ভিত্তি করেই কাযীগণ বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। তাঁরা সাধারণত চার প্রকারের শাস্তি প্রদান করতেন—

১. কিসাস্—হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রতিশোধ।
২. ‘দিয়া’ বা ক্ষতিপূরণ যা হত্যাকারী কর্তৃক প্রদত্ত হত।
৩. হদ্ বা প্রচলিত আইন মুতাবিক প্রদত্ত শাস্তি—যেমন :
 (ক) অবৈধ যৌন সংসর্গের ক্ষেত্রে প্রস্তর নিক্ষেপ,
 (খ) চুরির ক্ষেত্রে হাত কেটে দেওয়া ইত্যাদি।
৪. তাজির—সংশোধনার্থে কাযী কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলার মুসলমান-খন্দকার ফজলে রাব্বি।
২. তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত—জওহর আফতাবচী, চৌধুরী শামসুর রহমান
অনূদিত।
৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অনূদিত।
৪. Our Police Heritage—N. A. Razvi.
৫. Mughal Administration—Jadunath Sarkar.
৬. Administration under the Mughals—S.A.Q. Hussaini.
৭. Administration of Justice in Medieval India—M.B. Ahmed.
৮. Cambridge History of India.
৯. A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849-50—Sir W. H. Sleeman. Quoted from Foundations of Local Self- Government in India, Pakistan and Burma—Hugh Tinker.
১০. The Real Ranjit Singh—Fakir Sayed Waheed-ud-din. Adminis-tration of Justice by the Mughals— Muhammad Akbar.
১১. Discovery of Pakistan—A. Aziz.



ইসলামিক ফাউন্ডেশন